পরিচয়

সন্তোষকুমার দে

সোয়ান বুকস্
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৬০

মূল্য ২৷৷০

এই লেখকের

গল্প-উপন্যাস

ষ্ট্রাইক

পাণ্ডুলিপি

কৌতুক-যৌতুক

প্রবন্ধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন

নাটিকা

১৩৫০ সাল

কবিতা

পরিণয় (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশক—স্বপ্রকাশ বসু, ৩২, মহেশ বারিক লেন, কলিকাতা—১১

মুদ্রাকর—এন, ঘোষ, উৎপল প্রেস, ১১০।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বাবাকে -

সশ্রদ্ধ স্মরণে।

সূচী

সূচনা

গ্রামের কালীবাড়ী। অদূরে নদী, নদীর পাশে চর, চরের পরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বড়ো রাস্তা, রাস্তার পাশে একটা বুড়ো বটগাছ। বটগাছতলায় গোলপাতার দোচালা ছোট একখানি ঘরে মুদি-দোকান। পথচারী লোক-জন কেউ এসে অমনিতেই তামাক খেতে চায়, কেউ বা বিড়ি দেশলাই কেনে। গ্রামের মধ্যে আর হাট নেই। হাটবাজার সব মাইল দুই দূরে, থানা আর রেল-স্টেশনের কাছে। তাই গ্রামবাসীরা এই ছোট মুদি-দোকানখানির খরিদ্দার, ছোটখাট সওদা প্রায় সবাই করেন।

বড়বাবু কোন কাজকর্ম করেন না। ঠাকুরদাদার তালুকদারি ছিল, ভাগ হতে হতে তার চিহ্ন নেই বল্লেই হয়, তবু বংশমর্যাদাটা আছে। বাড়ুজ্জেবংশ কত বড় বংশ, এককালে তো গোটা পরগণাই তাঁদের তাঁবে ছিল। বংশমর্যাদার দাবীতেই বড়বাবুর রাপদাপ। তিনি দোকানে এলেই দোকানদার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে, আসুন আসুন বড়বাবু! নিজহাতে গামছা দিয়ে বেঞ্চের খানিকটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেয়।

বড়বাবুর কিন্তু মেজাজ চটে আছে। তিনি বল্লেন, দিনে দিনে হল কি, বলি তোরা কা'র ভিটেবাড়ির প্রজা তার খেয়াল আছে?

দোকানদার ততক্ষণে তামাক সেজে কলকেয় ফুঁ দিচ্ছে। তারপর কড়ি-বাঁধা হুঁকোয় কলকে চাপিয়ে বড়বাবুকে দিয়ে বল্লে----তামাক ইচ্ছে করুন বড়বাবু!

সাজা তামাক! কথায় বলে, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। বড়বাবু বসলেন এবং তামাকে কয়েকটা টান দিয়ে লক্ষ্য করলেন, দোকানের গদিতে বসে দোকানদারের ছেলে শুভঙ্করীর অঙ্ক কষছে।

তামাকের ফাঁকেই একটা অবান্তর কথা মুখে এলো বড়বাবুর, জিজ্ঞেস করলেন---ছেলেকে পড়াচ্ছিস নাকি? বড় হয়ে 'জজ' 'বালিষ্টর' হবে!

দোকানদার মুখ কাঁচুমাচু করলে। তার পয়সায় তার ছেলেকে পড়ানোও অপরাধ! ভিটেবাড়ির প্রজা কিনা পায়ের কাদা, যেমন আছে তেমন থাক, তা নয় ছেলেকে আবার ছাত্রবৃত্তি পড়ানো হচ্ছে!

দোকানদারকে নীরব দেখে বড়বাবু হাঁক দিলেন, কিরে, গুমোরে যে আর কথাই কইছিস না। প্রতাপের পাঠশালায় পড়ে বুঝি ছেলেটা?

প্রতাপও ভিটেবাড়ীর প্রজা, তার আবার পাঠশালা! বড়বাবুর মুখে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে যায়। কিন্তু যেজন্য তিনি এসেছিলেন এবার সে কথাটা ব্যক্ত করেন, বলেন---আড়াই সের নুন আর পাঁচ পো তেল নিতে ছিরিনাথ এসে ফিরে গেল কেন? বলে দিয়েছিস নাকি বাকীতে আর মাল দিবিনা?

দোকানদার ভয়ে জিভ কাটলে, বল্লে, এই কথা বলতে পারি! তবে বড়বাবু, আপনি তো আমার অবস্থা সব জানেন। আপনার হিসাবে ষাট টাকার উপর বাকী। মহাজনকে টাকা না দিতে পারলে আমিই বা মাল পাই কোথায়? তা আপনি যখন নিজে এসেছেন যা পারি মাল দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আগের বাকী টাকার কিছু অন্তত আজ দিন।

বড়বাবু চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন। মালটা আগে মাপা হয়ে যাক। আড়াই-পো তেল আর পাঁচ পো নুন মাপা হল। তেল দেখে বড়বাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন---শালা জোচ্চোর, চুরি করবার আর যায়গা পাসনি, এই তোর পাঁচ পো তেল?

দোকানদার বল্লে আজ্ঞে না, আড়াই পোয়া। আজ আড়াই পোয়া নিন।

-- কেন? ভিক্ষে নিচ্ছি? দাম দেব না?

বড়বাবুর চীৎকারে দু' একজন লোক জমে গেল। সবাই রঙ্গ দেখচে। ঘটনাটা বুঝচে সবাই, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ দোকানদারের হয়ে একটা কথা বলবে না। ও বেচারী ভালোমানুষ, কারো সাতে পাঁচে নেই---তাই সবার চক্ষুশূল। ঠকুক বড়বাবুর মতো ঠক জোচ্চোরের হাতে!

অনেক কটুকাটব্য করে সেই তেল নুন নিয়ে বড়বাবু চলে গেলেন। দোকানদারের অজ্ঞাতে তার ছেলের মুখ বৃথা আক্রোশে কালো হয়ে উঠল।

বড়বাবুর জ্ঞাতি কাকার ছেলে মন্মথ ইউনিয়ান বোর্ডের 'পিসিডেন্'। বৈকালে তার কাছ হতে তলব এলো। চৌকিদার যখন ডাকতে এসেচে তখন দোকানদারের চেপে জ্বর এসেচে, বাড়ীতে বারান্দায় শুয়ে আছে, এ বেলায় আর দোকানে যেতে পারে নি। জরুরি তলব, ধরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম---চৌকিদার নেহাত খাতির করে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বাপের পিছু পিছু ছেলেটিও গেল।

তিন বছরের চৌকিদারী খাজনা বাকী, মাল ক্রোকের হুকুম দেওয়ার আগে নেহাত ভিটেবাড়ীর প্রজা বলে দয়া করেই মন্মথবাবু তাকে ডেকেচেন।

অভিযোগ শুনে দোকানী তো থ। চৌকিদারী খাজনা দুবছরের পরিষ্কার আছে, এবছরেরটা এখনও দেওয়া হয়নি বটে। গত বছরের খাজনা মন্মথবাবু দোকান থেকে নিজে নিয়ে এসেছিলেন---অবশ্য রসিদ দেননি। তার আগের বছরের রসিদ দিয়ে তহশিলদার টাকা নিয়েছিল তাও খাতায় জমা হয়নি।

মন্মথবাবু সদয় ব্যবহার করলেন, বললেন, বলছিস 'তির্ত' (তৃতীয়) সনের খাজনা দিয়েছিলি। বেশ, রসিদের চেক মুড়ি রয়েচে, তোর ছেলে তো লেখাপড়া শিখেচে, ও দেখে খুঁজে বের করুক।

চৌকীদার একখানা ময়লা কাপড়ে বাঁধা পুরোনো চেকমুড়ি কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে দিলে। অধীর আগ্রহে ছেলেটি একটার পর একটা বই খুঁজে গেল, তার বাবার নাম মিলল না কোথাও। ছেলেটির হতাশ ভাব দেখে মন্মথবাবু

ব্যঙ্গ ভরে হাসলেন। হুকুম হয়ে গেল, সেদিনের মধ্যে বকেয়া চৌকিদারী খাজনা সব পরিশোধ না করলে দোকান থেকে মাল ক্রোক করা হবে।

ঘরের কোণে বড়বাবু বসে তামাক খাচ্ছিলেন, তিনি মন্মথবাবুর আদেশের উপর কি একটা মন্তব্য করলেন দোকানদার বা তার ছেলেটি তা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না।

ঘরে ফিরে দোকানদারের জ্বর বাড়ল। প্রলাপ বকতে লাগল সে। নগদ টাকা দিয়েও তা জমা হয় না, রসিদ পাওয়া গেলেও তাঁর চেকমুড়ি মেলে না, এর প্রতিকার তো সাধ্যের অতীত, যেমন সাধ্যের অতীত আজ বা এক মাসের মধ্যেও তিন বছরের চৌকিদারী খাজনা শোধ করা।

আর বাপের বিছানার অদূরে বসে তার ছেলেটি লিখতে লাগল। কী লিখচে তা সেও জানে না। যে অত্যাচারের অবিচারের পেষণে তার নিরুপায় বাবা জ্বরের প্রলাপেও ভুল বকছে তার কশাঘাত তার বালকমনেও গভীর দাগ দিয়েছে। সেই বেদনা ঝরছে তার চোখ দিয়ে, সেই বেদনার বাণীই ব্যক্ত করবার চেষ্টা করছে তার লেখনী। ক্রৌঞ্চমিথুনের বেদনায় মথিত হৃদয়ের উৎসারিত বাণী হতে আদি কবি বাল্মীকি এক মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন, আর অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদে এক তরুণের প্রাণতন্ত্রীতে যে বেদনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল তার ক্ষীণ ধ্বনি কি কোথাও এতটুকু সাড়া জাগাবে না?

:o:

নীচে যদ্দূর তাকাই সবুজে-নীলে-সোনালিতে একাকার। মাঝে মাঝে টিনের চালা চক্ চক্ করে ওঠে, খড়ের ঘরগুলি ফিকে বাদামী রং-এর টিপ মনে হয়। তারপর একঢালা গাছপালা, বাঁশঝাড়-বেতঝোপ সব একাকার।

আরো নীচুতে নামলাম। ষ্টীমার ঘাট হতে খুলনা সহরের নিশানা বুঝে ভৈরবের স্থত্র ধরে আমার গ্রামেরউ পর উড়ে এসেছি। গ্রাম চিনেছি ম্যাপ দিয়ে, কিন্তু আমাদের বাড়ীটা চিনব কি দিয়ে? রান্নাঘরের কাছে ছিল আস্তাকুড়, তার অদূরের দীর্ঘ নারকেল গাছটিতে চড়লে গ্রাম ছাড়িয়ে ভিন্ন গ্রামের বাড়ী ঘর, এই ভৈরব নদ নজরে পড়ত। কিন্তু আকাশ থেকে তাকিয়ে অত উঁচু গাছটাও চিনতে পারলাম না। ঝাপসা ছায়াছবি যেমন কাঁপতে কাঁপতে সরে যায় চোখের স্থমুখ দিয়ে, তেমনি ভাবে নীচের বাড়ীঘর, গাছপালা সরে গেল। আমার সঙ্গী সেন বল্লে---কি দেখছেন এতো?

উত্তর দিতে পারলাম না। সে জানে আমি এ নিয়ে হা-হুতাশ করি নে, করে লাভ কি বলুন? সাতপুরুষের বাস্তুভিটার জন্য মিথ্যা মায়া কেন? মায়া বৈ কি? পায়ের নীচে পরিদৃশ্যমান গোটা দেশটাই যেমন একাকার মনে হচ্ছে, আসলেও কি তাই নয়? বিশেষ করে আমার জন্মভূমি, আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা বলে চিহ্নিত একখণ্ড জমির উপর আমার অন্যায় দাবী কেন? কেন এই আকর্ষণ!

মাটির স্পর্শ ছাড়িয়ে পাখা মেলে যখন উপরে উড়ে আসি, নীচে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করি পৃথিবী গোলকটিকে। বৃহৎ গ্রহ, তার কতটুকুই বা নজরে পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হতে বিশেষ করে এক টুকরা জমি কি আমি উপরে তুলে নিয়ে আসতে পারি একান্ত আমার বলে, আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ছিল বলেই?

শুধু যে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন রাষ্ট্র, ভিন্ন কৃষ্টি-সভ্যতা ও শাসনতন্ত্রের কব্জায় ও জমিটুকু জব্দ হয়েছে তাতো ঠিক নয়, ও জমি আমি কক্ষনো সাথে নিয়ে আসতে পারতাম না যদি এই বৈমানিক জীবন যাপন করতে চাইতাম। মাটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকত, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবুও এ দুঃখবোধ কেন?

পৃথিবীকে ভালোবাসি বলে কি? হয়ত তাই, হয়ত সেই জন্যই বিশাল পৃথিবীর পৃষ্ঠে গোস্পদভূমিটুকুতে হলেও নিজের কায়েমি স্বত্ব পাকা করে রাখতে চাই।

কিন্তু তার কি কিছু প্রয়োজন আছে? বিশেষ করে আমার মতো উড্ডীয়মান জীবনে? চব্বিশ ঘণ্টার বেশ খানিকটা অংশই যার কাটে আকাশে, মাটির পৃথিবীর মায়াবন্ধন কাটিয়ে যেন সাময়িক ভাবে শূন্যেই বাসা বাঁধা।

সেন একটা নতুন হিসেব আমার মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করে, বলে--- পুরাণের কাহিনীতে আছে বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে আপন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞানের বলে মানুষ নিজের পৃথিবী নিজে গড়ে নিয়েছে, নিচ্ছে, আরো নেবে।

দূর আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই---পৃথিবীর অনেক যায়গায় সবুজের সমারোহ, অনেক যায়গায় উদার উদধি---ওই যায়গাগুলিতে সোজাসুজি ধরাতলে দৃষ্টি যায়। কিন্তু যখন কোন বড় সহরের উপর উড়ে আসি তখন দেখি মানুষ কত উঁচু উঁচু প্রাসাদ তৈরী করেছে। একশো তিনতলা তক্ উঁচু বাড়ীওতো মানুষের সৃষ্টি। তাতে পৃথিবীর পৃষ্ঠে যতটুকু স্থান অধিকৃত হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ স্থান মানুষ বুদ্ধি করে শূন্যে তৈরী করে নিয়েছে। "শূন্যে সৌধ নির্মাণ" কথাটা একেবারে গাজাখুরি নয় তা হলে।

আবার যখন ভাবি এই সব সংখ্যাহীন বহুতলবাড়ী যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিছিয়ে দেওয়া যেত তবে কতবার পৃথিবী বেষ্টিত হতে পারত, অর্থাৎ নৈসর্গিক কারণে পৃথিবীর ক্ষেত্রতল যতটা পরিমাণ বিস্তৃত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে তার উপরে আরো অনেক লক্ষ বর্গগজ 'জমি' নিজে সৃষ্টি করে নিয়েছে।

শুধু কি তাই? নৈসর্গিক জমি স্থাবর, থিওডোলাইটের মাপ ভুল হতে পারে, কিন্তু জমির স্থান পরিবর্তন হয় না। নদীর এক কুল যদি ভাঙে, অপর কুল গড়ে ওঠে। তাতে জমির মালিকের হয়ত লোকসান হয়, কিন্তু ধরাপৃষ্ঠের চৌহদ্দিটা বাড়ে কমে না। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক হিসাবে যদিই বা কিছু কমতি-বাড়তি ধরা পড়ে, স্থূল চোখে মনে হবে মোটামুটি সব ঠিক আছে।

অপর পক্ষে মানুষের সৃষ্ট জমি জাহাজের বুকে জলের উপর ভাসে, বিমানে আকাশে ওড়ে, চলমান ট্রাম-বাস ট্রেনে এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে চলে যায়, অর্থাৎ তারা সচল, স্থান পরিবর্তন করতে পারে। আমার বাবা যে বাড়ীতে বাস করতেন সেটা নিয়ে আসতে পারেন নি, কিন্তু যে গাড়ীতে চড়তেন সেটা সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভব হয়।

সব বুঝি, না বুঝলেও সেন সাগ্রহে বোঝাতে থাকে। সে জানে, ভিটের মায়ায় লাভ নেই, ওটা নেহাত ভাবালুতা মাত্র।

বিজ্ঞান ছেড়ে সেন অর্থনীতির দৃষ্টান্ত দেখায়। ল্যাণ্ড-লেবার-ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশান,—মুখ্যত এই চারিপদ বিভাগে বিভক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা। যা কিছু করতে চাও জমি, ভূমি বা ভিত্তি চাই। তবে অর্থনীতির জমি কেবল পৃথিবী পৃষ্ঠ না বোঝাতেও পারে। তাতে জমির আরো ব্যাপক ভাব গ্রহণের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ অর্থনীতির বিচারে জমির প্রয়োজন স্বীকার করলেও সেটা বাস্তুভিটাই হওয়ার কোন সার্থকতা নেই।

সে আস্তানা নির্বাচনের জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিক মিলবার সুবিধা এবং রেল-ষ্টিমার প্রভৃতি পরিবহন ব্যবস্থার সম্ভাবনাও বিচার করা দরকার।

জন্মস্থানের উপর আমাদের জন্মমাত্রই কোন টান জন্মে না। সেটা দিনে দিনে জমে ওঠে। অপর পক্ষে মানুষ বাসস্থান পালটাতে পারে কিন্তু জন্মস্থান পালটাতে পারে না। সেটা তাকে বিধি-নির্বন্ধের মতোই মেনে নিতে হয়। তাই দৈবাৎ যে গ্রামে আমি জন্মেছি এই গ্রামের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা অস্বীকার করতে পারিনে।

আর গোটা গ্রাম আমার কাছে যে গৃহখানিকে কেন্দ্র করে বেঁচে ছিল সেখানেই তো আমার সাতপুরুষের বাস। আমার সব চিন্তা---চেষ্টা—চেতনা—আনন্দের আদি লীলাস্থল। তাই বাইরের দৃষ্টিতে তা যতো অকিঞ্চিৎকর হোক অন্তর দিয়ে ভাবলে তার কোন তুলনা হয় না।

চার চৌহদ্দি আঁটা ভূমিখণ্ড কেনা কঠিন নয়, কিন্তু এই বাস্তুভিটা কি টাকা দিয়ে কেনা যায়? এযে কতো স্বপ্নে তৈরী, কতো স্মৃতি-স্বাক্ষরিত! টাকায় তারতো কিছুই কেনা সম্ভব নয়।

বাবার মুখে শুনেছি আমরা এই গাঁয়ের আদিম বাসিন্দা ছিলাম না। আমরা 'বাঙ্গাল', আজো আমাদের বাড়ীকে বাঙ্গাল বাড়ী বলে। পূর্ববাংলার কোন দূর অঞ্চল হতে আমাদের বংশের কোনও ঊর্ধ্বতন পুরুষ ব্যবসাসূত্রে পাশের গঞ্জ ফকিরহাটে এসেছিলেন। তারপর হয়ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলে এখানেও বাড়ীঘর করেন, বিষয় আসয় করেন। সেই অবধি গোটা পরগনার লোক আমাদের বাড়ীকে 'বাঙ্গাল বাড়ী' বলে। ওই বাড়ীতে আমার অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ হতে সুরু করে পিতামহ জ্যেষ্ঠতাতরা দেহ রেখেছেন। বাবা বিদেশে এলেন নেহাত অনিচ্ছায় দেশে যখন আত্মীয়-স্বজন ডাক্তার-কোবরেজ কেউ রইল না, মা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর চিকিৎসা হয়না, তখন নিতান্ত বাধ্য হয়েই বাবা বিদেশে এলেন। এখানে এসেও কি কোনদিন ভুলতে পারলেন সেই বাড়ী!

মাত্র দুশো মাইলের মধ্যে, তবু যেন কত দূর, যেন সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশের কথা। সেই ভাবে নাতি-নাতনীদের কাছে দেশের গল্প করতেন। আমরা কাছে যেয়ে বসলেও নানা প্রসঙ্গে সেই বাড়ীর কথা, বারোমেসে আম গাছের কথা, ধবলী গাইয়ের কথা, মাঠের পুকুর পাড়ে আনারস বাগানের কথা, কুয়াতলার কলম্বলেবুর ঝাড়ের কথা কত কিছু বলতেন।

বাবা মারা গেলেন বাড়ীর কথা মুখে নিয়ে। শ্রাদ্ধাদি চুকোতে টাকার দরকার। মাথার উপর থেকে বাবা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম এখন আমিই বাড়ীর বুড়ো। আগে যে সব প্রসঙ্গে সবাই বাবার মতামত চাইত, এবার আমার মত চাইছে। ছোট ভাই এসে বল্লে, মামার বেয়াই তার সহরের বাড়ী ছত্রিশ হাজারে ছেড়েছেন, মামা তার বাড়ীর খরিদ্দার খুঁজছেন, তুমিও একবার যাওনা, যে দাম পাও জমিজমা ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এসো।

বাড়ী গেলাম। গ্রামের পথঘাট ঘনজঙ্গলে ভরে উঠেছে। লোকজন নেই। আমার জ্যেঠতুত বোন দেশে ছিলেন, তিনিও ইতিমধ্যে মারা গেছেন। আমার ভগিনীপতি অকালেই বুড়ো হয়ে গেছেন। তবু তিনিই সমাদর করে বসালেন। আর কার কাছেই বা যাবো, গ্রামে আছেই বা কে।

তবু গ্রামটা শেষবারের মতো দেখবার জন্য পথে বেরুলাম। পথ নির্জন। পায়ে পায়ে চলে এলাম নদীর দিকে। এর নাম বটতলার ঘাট। একটা বুড়ো বট ঝুরি নামিয়ে তলাটা অন্ধকার করে রেখেছে। তলা দিয়ে একটা পথ গিয়েছে নদীর দিকে, আর একটা গ্রামের দিকে, আর একটা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক হয়ে মহকুমা সহর ও রেল ষ্টেশনের দিকে।

এই গাছতলায় মেয়েরা পূজো দিতে আসত, মানত ঝুলিয়ে দিত বটের ডালে কাপড়ের পুটলি বেঁধে। ইতু পূজো হত বুঝি ঋতু বিশেষে। ঘুটের ছাই আর বেনেবউ ফুল দিয়ে বাসিমুখো দেবতার পূজো হত।

মাঘ মোড়লের ব্রত করত আমার দিদি, তার সাথে খুব ভোরে ফুল কুড়াতে যেতাম। মা দোলাই চাদর গায়ে জড়িয়ে পিঠের কাছে গিঁট বেঁধে দিতেন। শীতের সকালে শিশির ভেজা মাটিতে পা দিতে গা শিউরে উঠত। মাটিতে কেঁচো গড়িয়ে যেত। শীত শীত, তবু কেমন মজা লাগত। বেনে-বউ ঝোপের উপর মাকড়সার জাল শিশিরে ভিজে থাকত। তাতে রোদ পড়লে সাতরঙ্গের বাহার খুলত। তলায় যেয়ে দাঁড়াতে টুপটাপ শিশির গায়ে পড়ত।

চলতে চলতে সেই বটতলা পর্যন্ত যেয়ে থেমে যেতাম। এর ওদিকে ছোটদের যাওয়া নিষেধ। ওদিকে ভয়ের রাজ্য। বৈচীবন, গোখরো সাপের বাসা। তার ওপারে তালগাছ, খেজুর গাছ মাথা বাড়াচ্ছে। এই বন জঙ্গল ঘেরা জমিখানা পেরুলে চর, তার পরে নদী। কী রহস্য জমা ছিল বৈচী বনের পিছনের জঙ্গলে!

বাল্যের সেই আতঙ্ক-মেশা রহস্যপুরীর দরজাও এক দিন উন্মুক্ত হয়েছিল আমার কাছে। পথের বাম পাশের কালভার্টের মুখের সুড়ঙ্গ পথে বসে বসে চলে গেলে পৌঁছানো যায় পথের ডাইনের দুর্ভেদ্য বৈচীবনের পিছনের জঙ্গলে। সেখানে নালাটা একটা খালের মুখে পড়েছে। শুকনা পাতা ছড়ানো হলেও জায়গাটা অধিকতর প্রশস্ত। কাছেই বিস্তৃত বেতঝোপ। শীতকালে কেঁদো বাঘ মাঝে মাঝে এসে এখানেই বাসা বাঁধত। বেতঝোপের তলাটা যেমন নিরিবিলি তেমনি পরিষ্কার। স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকা যায়।

ঘন গুল্মের ঝোপ, কুলগাছের জঙ্গল পেরিয়ে পাতলা ইটের কয়েকটা ভাঙ্গা কোঠা নজড়ে পড়ে। তার উপরে শ্যাওলা ধরেছে, বট গাছ গজিয়ে ডালপালা বিস্তার করেছে। এককালে নীল কুঠির সাহেবদের আস্তানা ছিল, কালক্রমে কেবল মনুষ্যপরিত্যক্ত হয়নি, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপের বাসায় পরিণত হয়েছে।

গ্রামের ঘনবসতির বাইরে নদীর নিকট এমন চমৎকার নিরিবিলি যায়গার লোভ সামলাতে পারেনি যারা এর থেকেও গহন পথের যাত্রী, তারা তাই এটাকে একটা ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। দুষ্প্রাপ্য এবং আইনত অপাঠ্য বই থেকে সুরু করে টাকাকড়ি আগ্নেয় অস্ত্র সব কিছুই দরকার মতো এখানে মজুত রাখত এবং এখান থেকেই জেলার নানাস্থানে চালান দেওয়া হত।

যাঁরা এপথে এসেছিল তাঁদের অনেকের কথা মনে পড়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যুদ্ধে জালালাবাদ পাহাড়ে প্রাণ দিয়েছিলেন একজন, বালেশ্বরে গেছেন একজন। হাত উড়ে যেয়ে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ছিলেন একজন। আর কয়েকজন 'ভগিনী রাষ্ট্রে' অন্তরীণ। বাকী যারা তারা বেপাত্তা, কী এপারে, কি লাইনের ওপারে কেউ কোথাও একটা ডেপুটি সেক্রেটারিত্বও পায়নি। অথচ তারাই এই দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিল। পন্থা তাদের ভ্রান্ত বিবেচিত হতে পারে কিন্তু তাদের নিষ্ঠায় খাদ ছিল না।

ঝির্ ঝির্ করে বাতাস বইচে ঠিক যেমন আমার ছোট বেলায় বইত। বট-অশ্বত্থের পাতায় তখনও যেমন নাচন লাগত এখনও তেমনই তারা নাচছে। শুধু আমিই বদলেছি। আর বদলেছে এই দেশ, এই মাটি। মিঠে মাটি যেন নোনা হয়ে গেছে।

বাতাস বদলায়নি, নদী বদলায়নি, গাছ বদলায়নি, তবু কি জমি বদলে গেছে, দেশবিভাগের সঙ্গে গেছে এর মাটির মমতা। তাই কি সত্য? দেশ বলতে কি তবে শুধু মানুষই বোঝায়, মাটি কিছু নয়, কিছু নয় এই জমি? যার জন্য এত মমতা, এত লালসা, এত কামড়াকামড়ি সে কি সবই ভূয়া?

পশ্চিমের আলো এসে পড়েছে পথের পরে, লাল-সূর্যের রক্তিম আভায় গোটা বনস্থলীর চেহারা আমার কাছে অপরূপ দেখালো। ধারে কাছে

কেউ নেই। সেই জনহীন পথপ্রান্তে শুধু আমি আর আমার আজন্ম পরিচিত গ্রাম, আমার জন্মভূমি দু'জনে যেন বহুদিন পরে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম। এ আর বিমান থেকে উঁকি দিয়ে দেখা নয়, বিদেশ থেকে মুহূর্তের জন্য এসে দুদণ্ডের দেখা নয়, যেন আমার চৈতন্যের মধ্যে তার সত্তা ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। চোখের সুমুখে আমার শৈশব বাল্য কৈশোর যৌবনের দিনগুলি চলচ্চিত্রের মতো ভেসে গেল। তার সমগ্র পটভূমিকায় প্রসারিত হয়ে আছে এই গ্রাম, এই নদী, এই বন, এই পথ, এই শতপরিচিত গাছ-লতা-পাতা। এদের রসে পুষ্ট, এদের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত এই দেহ এদেরই একজন, একে আর ভিন্ন করে ভেবে ছিন্ন করে দূরে রেখে চিন্তা করতে পারলাম না। অভিভূতের মতো বাড়ী ফিরে গেল্লাম!

জমিজমা বিক্রি করা হল না।

:০:

দুধ

হাসপাতালে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসন্তকে ছেড়ে দিলে। বেশ খিদে পেয়েছে তার, একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খাবে মনে করলে, কিন্তু তাতে বাড়ি ফিরতে আরো দেরি হ'য়ে যাবে। বাড়িতে সবাই এতক্ষণে কি করছে কে জানে। বাবাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, এতক্ষণে সত্যি সত্যিই বাবার হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে ফেলেছে কিনা কে জানে।

বাবার বয়স বিরাশির উপর, চুল একগাছিও কালো নেই, কিন্তু একটাও দাঁত পড়েনি, দেহের গঠনে শিথিলতা আসেনি, এখনও জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে বসে সমানভাবে খেতে পারেন, ইচ্ছা করলে দু-পাঁচ মাইল পায়ে

হাঁটতেও পারেন। কিন্তু হাঁটবার যো আছে কি? পথেঘাটে যেন দিনরাত মেলা বসে গেছে, এত লোক বাবা জীবনে কখনো পথেঘাটে দেখেন নি। ঘরে বসেই কাগজ পড়েন, রেডিও শোনেন, ছোট শিশুদের নিয়ে খেলাধূলা করেন, সেই ভাবেই দিনের পর দিন যায়।

বসন্তের মা কলকাতায় এসেই অসুখে পড়লেন। শুয়ে দু-মাস ভুগেও গেলেন না। বাড়িঘর ছেড়ে আসবার শোকটা তাঁর বুকেই বেজেছিল সব চেয়ে বেশি। শেষরাতে উঠে গোবর ছড়া দিয়ে উঠোন ঝাড় দিতেন, গোয়াল নিকোতেন, সবাই উঠবার আগে সারা বাড়ি তাঁর স্নেহসম্মার্জনে ঝক্‌ঝকে হ'য়ে উঠত। এই শীতের দিনে নতুন ধান উঠত, উঠোন কোণে ধানের মরাই, মা মরাইয়ের গায়ে নতুন সিন্দূর ফোঁটা আঁকতেন। লাউ কুমড়োর মাচা, পালং শাকের ক্ষেত, আলুর পিলু, সর্বত্র তাঁর স্নেহদৃষ্টি। পুকুরপাড়ের হাঁস, বসন্তের ছাগল আর কর্তার গাই-বাছুর কে তাঁর স্নেহসুধা হ'তে বঞ্চিত ছিল? সেই সব ছেড়ে এসে তিনি দুই মাসও কলকাতায় বাঁচলেননা। বদ্ধ ঘরের ছোট্ট সীমানায় তাঁর মুক্ত মন হাঁফিয়ে উঠল, ছেলেদের বৌয়েদের কারো কোন যত্নেই তিনি মনে তৃপ্তি পেলেন না। অসুখে পড়লেন, আর সেই অসুখেই কুড়িদিন ভুগে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে শাঁখা সিন্দূর নিয়ে স্বর্গে গেলেন। বাবা সেই অবধিই আরো গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। পথেঘাটে বেরুবার উৎসাহও তাঁর নষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু ঘরে বসে থেকে কখনো তিনি মুখ গোমড়া ক'রে থাকতেন না। পড়াশুনা, বিশেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে বেশি সময় কাটাতেন। কিসে কি হ'য়ে গেল। ক্রমে মেজাজ খিট্‌খিটে হ'য়ে উঠল ; ভাতে রুচি নেই, মাছে মন ওঠে না, দুধ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পানীয়, তাও বিস্বাদ ব'লে দূরে রাখেন।

আগের দিন উপোষ গেছে। একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিনি বহু বছর ধরে প্রতিপালন করছেন। তেমনি কিসের উপোষ। পরদিন

সকালে বসন্তের বউ একবাটী গরম দুধ নিয়ে গেল শ্বশুর খাবেন ব'লে। খেলেন না। তিন ছেলে একে একে, শেষে একযোগে সাধ্যসাধনা করলে, তিনি কিছুতে কিচ্ছু খাবেন না। ক্রমে বেলা হ'ল, সূর্য তেতে উঠল, বাড়ির সবাই একে একে স্নান করলে, বাবা ঠিক তেমনি বসে রইলেন। তিনি স্নান করবেন না, খাবেন না। মুখে তখন জিঘাংসা জেগে উঠেছে, বলছেন তিনি সবার ষড়যন্ত্র বুঝতে পারছেন, সবাই তার গলা টিপে মারবার ষড়যন্ত্রে আছে, বিষ খাওয়াবার আয়োজন চলছে। তাই তিনি আর কিচ্ছু খাবেন না।

বিকালে বসন্ত বাবার কাছে আবার গিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগল 'কিছু খান্। অন্তত একটু দুধ।' দুধ বাবা জীবনে কোনদিন প্রত্যাখ্যান করেন নি। আজ প্রথম দুধ খেতে অস্বীকার করছেন।

বসন্তের হাত থেকে গরম দুধের বাটি এবার তিনি চেয়ে নিলেন। মুখ ধোয়ার জল আনতে বসন্ত যেমন টেবিলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে অমনি তিনি হুমকি দিয়ে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধভরা বাটিটা ধাই ক'রে বসন্তের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন। দুধে গা ভিজে গেল, আর রক্তে ভিজে গেল বসন্তের গায়ের গেঞ্জি। বাটির কানায় বসন্তের কপালটা গভীর ভাবে কেটে গেছে। ছোট ভাই ছুটে এসে দাদার কপাল চেপে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। মেজ ভাই বাবার ঘরে তালা লাগাল। তারপর ভাইয়ের সঙ্গে রিক্সা চেপে হাসপাতালে এসেছে বসন্ত। শুনে এসেছে মেজ ভাই বাবাকে শাসাচ্ছে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, নিজের ছেলেকে তুমি খুন ক'রে ফেলতে চাইছ। হাতে পায়ে শিকল দিয়ে রাখব···

বসন্ত ভাবতে লাগল। বাবা এমন হ'য়ে গেলেন কেন? বসন্তের গায়ে দুধ শুকিয়ে চট্‌চট্ করছে, ভ্যাপসা গন্ধ পাচ্ছে শুকনো দুধের আর রক্তের। দুধে রক্তে মিশে তার গায়ের গেঞ্জিটার খানিকটা চড়্‌চড়ে হয়ে উঠেছে।

আজ সে স্নান করবার অবকাশ পায়নি, শেষবেলায় তাকে দুধে স্নান করিয়ে ছাড়লেন বাবা। দুধের এত অপচয় বাবা সইলেন কি ক'রে!

দুধের কথায় কত কথাই মনে পড়ে। বাবা নিজের হাতে দুধ দুইতেন। দুধের কেঁড়েয় ফেনা ভরে উঠত, কাঁচা দুধও গরম, যেন সদ্য কড়া হ'তে নামান হয়েছে। ফেনার উপর ননী ভাসছে। সেই কাঁচা দুধের কি স্বাদ, কি সৌরভ! বাবা সেই দুধ এনে সকালের সফেন ভাতে ঢেলে খেজুরের গুড় মেখে খেতেন। বসন্ত কতদিন বাবার সঙ্গে বসে সেই দুধভাত খেয়েছে, তার স্বাদ যেন এখনো মুখে লেগে আছে।

দুধের কথায় মনে পড়ে আহ্লাদী, ধবলী আর রাঙ্গীকে। চাকর-রাখালের সঙ্গে যে যেমন ব্যবহারই করুক বাবার কাছে তারা যেন ছোট্ট মেয়েটি। বাবা তাদের 'মা' ব'লে ডেকে আদর করতেন, তারা গলা উঁচু ক'রে সে আদর গ্রহণ করত। তাদের গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিয়ে, এঁটুলি বেছে দিয়ে, গা চুলকে বাবা কত আদর সোহাগ করতেন। বাবার নিজের মেয়ে ছিল না যেন সেই স্নেহটা গিয়ে পড়েছিল এই অবোলা জীবগুলির উপর। নাম ধরে ডাকলে তারা বুঝতে পারত, ডাকে সাড়া দিত, হেঁটে কাছে আসত।

বাবার কড়া হুকুম ছিল, বাছুর কষ্ট পাবে, এমনভাবে যেন কেউ কখনো দুধ না দুয়ে নেয়। আর কারো উপর তেমন ক'রে বিশ্বাস করতে পারতেন না ব'লেই নিজে দুধ দুইতেন। বাছুর বড় না হওয়া পর্যন্ত মাত্র দুই বাটের দুধ দুইতেন। বাছুর বড় হ'য়ে ঘাস খেতে শিখলেও বরাবরই একবেলা মাত্র দুইতেন। আর একবেলার দুধ বাছুরের জন্য চিরদিনই বরাদ্দ ছিল। এই শীতের দিনে বাছুরদের জন্য চটের জামা ক'রে দিতেন। বাছুরদের চট বিছিয়ে শুতে দিতেন। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে 'সাজাল' ধরিয়ে প্রচুর ধোঁয়া দিয়ে মশা তাড়াবার ব্যবস্থা করতেন, আর সারারাত সাজালের গনগণে আগুনের পাশে আরামে শুয়ে গরুগুলি

জাবর কাটত। মেঝেতে পুরু ক'রে ছাই বিছানো থাকত যাতে মাটির মেঝেতে শীত না লাগে। এর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ বাবা নিজে না দেখে, দরকার মতো নিজের হাতে না ক'রে শান্তি পেতেন না।

শীতের দিনে গোয়ালঘরের বেড়া যেখানে যেটুকু ফাঁক থাকত সব খেজুরের পাতার আচ্ছাদনে ঢেকে দিতেন, যেন শীতের হিমেল হাওয়ায় গরুবাছুর কষ্ট না পায়।

জমির ধান উঠে গেলে সব গরুবাছুর চরে খেতে ছাড়া পেত। প্রায় দিন সন্ধ্যায় সবাই নিজেই ঘরে ফিরে আসত। যদি কোনদিন কোনটির ফিরতে দেরি হ'ত বাবা নিজেও খুঁজতে বেরুতেন। শীতের রাতে কোন গরু বাইরে থাকবে এ তিনি হ'তে দিতেন না। একবার একটি গরুর ছোট্ট বাছুর মায়ের সঙ্গে একটি গভীর নালা লাফিয়ে পার হ'তে গিয়ে ভিতরে পড়ে আর নিজে নিজে উঠতে পারে নি। সন্ধ্যার আগেই গাই একা বাড়ি ফিরে এলে বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাছুর কই? গরু তো আর জবাব দিতে পারে না। বাবা বল্লেন, কোথায় ফেলে এসেছিস চল্ নিয়ে আসি। দিব্যি তাঁকে পথ দেখিয়ে গাই সেই নালার কাছে নিয়ে গেল। বাবা বাছুর কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এলেন। গরু তো নয় তারা, তারা ছিল সাক্ষাৎ সুরভি, বাবার মনের কথা তারা বুঝত, বাবাও তাদের মনের কথা বুঝতেন। যে যে গাই দুধ দিত তাদের জন্য খোলের বরাদ্দ বেশি ছিল, এই নিয়ে এদের মধ্যে কত মান অভিমান চলত। বাবা সব বুঝতেন, কতদিন এর ভাগ ওকে কিছু দিয়ে খুশি করতেন।

সেই গরুর বাঁটের দুধে আর মাতৃস্তন্যে কি কোন পার্থক্য ছিল! দুধ তো নয়, যেন বটের আঠা। বাছুর যত বড় হ'ত, দুধ তত ঘন হয়ে উঠত। আর পাল-পার্বণে সেই দুধ যেত কালীবাড়ি, নারায়ণের বৈকালীতে, শিবপূজায়, মায়ের সুবচনী সত্যনারায়ণ শনি পূজার সিন্নিতেও জলের কাজ দুধ দিয়ে করা হ'ত।

সেই দুধ, সে তো কেবল দুধ নয়, একটা প্রাণবন্ত বস্তু, তার প্রত্যেকটি ফোঁটার সঙ্গে যেন পরিচয় আছে। আর বসন্ত যে দুধ যোগান নেয়, নিজের লোক খাটালে পাঠিয়ে আনিয়ে নেয় ব'লে তা তিন পোয়া জলে এক পোয়া দুধ দেওয়া নয় বটে কিন্তু তবু সে শুধু দুধ। বাবার যদি সে দুধ ভালো না লাগে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ভাইয়েরা এত কথা জানে না, ভাবে না, বোঝে না, তারা তাই রাগ করে। কিন্তু বসন্তের মনের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে। বাবা যে বলতেন, গরু হ'ল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, গরুর গায়ের গন্ধে গৃহ পবিত্র হয়, দুধে দেহ দেবালয় হয়ে ওঠে সে কথার তাৎপর্য ভাইয়েরা বুঝতে পারবে কি ?

ভাবতে ভাবতে বসন্ত বাড়ি ফিরে এলো। উঁকি দিয়ে দেখে, বাবা সন্ধ্যার আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। শীতের সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে গোয়ালঘরে 'সাজাল' ধরানো হ'ত, তারই সাদা ধূম ঘুরে ঘুরে গোয়ালঘর ভরে যেত, তারপর খড়ের চাল ফুঁড়ে ঊর্ধ্বে আকাশে উঠতে থাকত। বসন্তের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো, বাবার বুকের বেদনা তার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল।

ঃ০ঃ

কমলার কাহিনী

কোন বড় জংসনে একখানা ট্রেন থেকে নেমে আর একখানা ট্রেনের জন্য যখন কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তখন আপার ক্লাশ ওয়েটিংরুমে ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে হালকা সাহিত্য পড়ুন অথবা কলম নিয়ে ডাইরি লিখুন, এর চেয়ে আরামের জিনিষ ভ্রাম্যমান জীবনে আর আমি পাইনি। নতুন সহরে যেয়ে সব যায়গায় লণ্ডনের ডরচেষ্টারের মতো

হোটেল মিলবে তেমন ভরসা কম। মিললেও সেখানে হয়তো নেহরুর মতো কোন গণ্যমান্য অতিথির জন্য সারা বাড়ীটা সরগরম হয়ে আছে, নতুবা হাজার স্থানীয় দর্শনীয় বস্তু টানবে আপনার মন, তিষ্টুতে দেবেনা ঘরে।

কিন্তু এই ওয়েটিংরুম, নিতান্তই প্রতীক্ষা করবার জন্য তৈরী। ছোট বেলায় ইস্কুলে পড়েছিলাম একটি ইংরাজি কাহিনীতে, কোন বৃদ্ধা মাতা সাগরকূলের ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখত, তার নাবিক পুত্র ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায়। এই ওয়েটিংরুমের বাতি জ্বলছেই, আপনার আমার সবার জন্য। লৌহবর্ত্মের উপর ঢেউ জাগিয়ে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার-মেল এক্সপ্রেস-লোকাল। কতজন নামছে, উঠছে। এলো গেল আপনার পাশে ভারত-ব্রহ্ম-চীন হতে সুদূর ন্যুইয়র্কের পণ্টিন্নাক হোটেলের লেবেল লাগানো এটাচি-ওয়ালা সুটকেশ স্যুট-ধারী। আপনার খেয়াল রাখবার দরকার শুধু হাতঘড়ির দিকে, আপনার ট্রেনের সময়টা আপনি জানেন।

অমরাবতী হতে ফিরে নাগপুর যাব। বাডনরা জংসনে এসে মেলের অপেক্ষা করছি। গাড়ি আসবে প্রত্যূষে। এখন সবে সন্ধ্যে।

কেরোসিনের আলো জ্বালা একখানা গোল টেবিলের উপর, দেওয়ালে একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে দার্জ্জিলিংএর ছবি, তলায় লেখা 'ভারতবর্ষ দেখুন'। আশে পাশের যাত্রীরা লিগ কংগ্রেস আর কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করছেন। আমার পকেটে তাকিয়ে দেখি, কলমটার ক্লিপে কেরোসিনের আলো চিক চিক করছে।

কলমেরও ভাষা আছে,---আমরা সেটা ভেবে দেখি না। ভেবে দেখুন আপনার কলমটি দিয়ে এযাবত কতকিছু লিখেছেন, প্রেমপত্র হতে সুরু করে 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট' পর্যন্ত। যারা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ তারা বলতে পারবেন, কত লক্ষ টাকার চেক সই করেছেন এই কলমে। কিন্তু এমন কিছু কি করেন নি যাতে হৃদয় হাল্কা হয়ে গেছে, মনে

হয়েছে আপনি যে কথা মুখে বলতে পারেন নি তাই লিখে রাখলেন। এমনও কি হয় না, যে কথা আপনার অবচেতন মনেই গুপ্ত ছিল, কলম জানত সেই কথা, আপনার অগোচরে সে কথা সে বলে দিয়েছে। পরে আপনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন, মনে হয়েছে যেন খানিকটা কর্তব্যপালন হ'ল, যেন ঋণশোধ হ'ল কিছুটা। কিন্তু সব ঋণ তো শুধবার নয়। বলি শুনুন একটা ছোট্ট ঘটনা।

আমি ঘুরছি অনেকদিন বাংলার বাইরে। আমার চেহারাটা কন্দর্প-কান্তি নয় বলেই জানি, পরন্তু ট্রেনে টহল করে বেড়ালে কন্দর্পেরও দর্প থাকত কিনা সন্দেহ। কোথায় স্নান, কোথায় আহার কিছুরই ঠিক নেই। নেহাত শরীরটার বয়স বেশী নয়, তাই সয়ে যাচ্ছে। তবে যেদিনের কথা বলছি সেদিন রীতিমত অবগাহন স্নান করেছি, পথে ঘাটে যা নিতান্তই অমিল বস্তু। ওখায় সমুদ্র পেয়ে ডুবিয়ে নিলাম এক চোট। পুরীর সমুদ্রের মতো অত বড়ো বড়ো ঢেউ নেই। জল দূরে গাঢ় নীল, তবে ওয়ালটেয়ার-বিশাখাপট্টমের সমুদ্রের মতো নয়। নিকটের জল নীলাভ।

তীরে বড় বড় দানার উজ্জ্বল বালি প্রচণ্ড রোদে চিক চিক করছে। অনেক দূর নিয়ে বালুর চর। ছোট ছোট জাহাজ মেরামত করছে কাথিয়াবাড়ী মিস্ত্রী। স্নানের ঘাটে আলাপ হ'ল নাসিকের বালকিসন নামে একটি যুবকের সাথে। সে কলকাতা চেনে, গেছে ভারতের ছোট বড়ো নানা সহরে আমারই মতো ভবঘুরের বেশে। ওর সঙ্গে খাতির হয়ে গেল।

ফিরলাম একসঙ্গে, এক ট্রেনে, ঠাসাঠাসি ভিড় তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কামরায়।

তখন কলকাতায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালি দেখলেই হাজার রকম প্রশ্ন। এমন কতবার কতো প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে আমাকে। এখানেও ঝঞ্ঝাট বাধালো বালকিসন, কথা প্রসঙ্গে বলে ফেল্লে আমি বাঙালি। কিন্তু আমার চেহারা বা

চালচলন যে বাঙালিসুলভ নয় এটাই সন্দেহ করলেন একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী। কলকাতার সুতাপটিতে তাদের 'চল্লিশ সালকি' কারবার আছে। 'বন্দিপাধ্যায়', 'মুকারজি' প্রভৃতি তার কত 'দোস্ত' আছে, 'জান পচান' আছে 'হরেক কিসিম' বাঙালি বাবুর সঙ্গে। কিন্তু 'দে-বাবু' 'কভি নেহি শুনা'।

সন্দিগ্ধ স্বরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি বাঙালি, 'সাচ' বলছেন ?

কি উত্তর দিই ? বল্লাম—বাংলা দেশে জন্মালে, মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন সবাই বাঙালি হলে যদি বাঙালি হয় তবে আমি বাঙালি।

আবার প্রশ্ন হ'ল—আপনি বাংলা বুলি জানে ?

না হেসে পারলাম না, বল্লাম, আমি বাংলা বল্লে কি আপনি বুঝতে পারবেন ?

'জরুর।' তিনি বল্লেন 'হাম ভি বাংলা সামঝাতে পারি। আচ্ছা বলিয়ে জি জরু কৌন চিজ হ্যায়।

বল্লাম উত্তরটা।

আবার প্রশ্ন—'মাশায় কেমন আছে' এর 'সামাল' কি ?

হাসি চেপে জবাব দিলাম।

আবার প্রশ্ন—হামি ভালো আছে।

বলমাম উত্তর।

প্রশ্নকর্তা বল্লেন—বাংলা আপনি থোড়া থোড়া সমঝেচেন। 'লেকিন' লিখা পড়া তো নেহি আয়ে গা।

বালকিসন এবং নিকটস্থ অনেকগুলি সহযাত্রী এতক্ষণ সাগ্রহে আমার অগ্নিপরীক্ষা লক্ষ্য করছিল। এবার বালকিসন রুখে উঠল,—বল্লে, লিখা পড়া পারবেন না মানে ? ইয়ারকি নাকি ? কাগজ বের করুন, দেখাচ্ছেন লিখে।

মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও এভাবে নিজেকে বাঙালি প্রমাণিত করবার অদম্য উৎসাহ আমার ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। জানিনা বালকিসনের মতো আমিও এবার তেড়ে উঠতাম কিনা। সকালে দ্বারকা হতে ট্রেনে চেপে ওখা গেছি, তিন মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেট দ্বীপে মন্দির দর্শন করেছি। এপারে এসে সমুদ্রস্নানের পর সারা বন্দরে এক টুকরা পুরী কি ভাজি পাই নি, এক কাপ চিনিশূন্য চা খেয়েছিলাম, তদবধি পেটে কিছু পড়ে নি। মাথায় তেল নেই, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ে চোখে মুখে পড়ছে। পেটও চোঁ চোঁ করছে। বাইরে বাতাসে বালি উড়ে আসে, ট্রেনের ইঞ্জিন হতে ছাই ও কয়লার গুড়া উড়ে আসে, তাই চোখের গগলস আঁটা আছে। জামা কাপড় তীর্থকাকের উপযুক্ত অবিন্যস্ত এবং যথাসাধ্য ময়লা। এই বেশটাকে বাঙালির বলে প্রমাণিত করবার দৃঢ় ইচ্ছা ক্রমেই আমার শিথিল হয়ে আসছিল। কিন্তু এই সময় একটি অঘটন ঘটল।

আমার বেঞ্চের সুমুখের একখানা বেঞ্চ পেরিয়ে দ্বিতীয় বেঞ্চে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে একটি সুশ্রী যুবতী। তার গায়ের রংটা উজ্জ্বল গৌর, মুখাবয়ব অনেকটা আমার ছোট বোনের মতো, হাতে সরু চুড়ি, গলায় সূক্ষ্ম মফচেন, কানে মুক্তার দল বসানো কুণ্ডল। এলো খোঁপার উপর মাথায় সামান্য কাপড় দেওয়া। শাড়ী পরবার ধরণটাও অবিকল বাঙালির মতো, এমনি কি গায়ের সেমিজটাও। সহসা দেখলে তাকে বাঙালি বলে ভুল করা কঠিন নয়, কিন্তু মুখাবয়বে অবাঙালিত্বের বিশিষ্ট ছাপ অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে।

পাশেই তার ছোট বোন, অত্যন্ত চঞ্চল। মুখখানা অবিকল বড় বোনের মতো। বাংলায় হলে ও বয়সে সে ফ্রকই পরত, কিন্তু তার মাথায় ওড়না, পরণে শাড়ী। এদের সাথে আর কে আছে জানতে পারিনি।

কাব্য করবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না সে কথা

পূর্বেই বলেছি। বেলা পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ক্লান্ত হয়ে আসছিল। লবণ সমুদ্রে স্নান করবার দরুণ চর্মে খড়ি উড়তে লাগল। কৌতুকজনক ব্যাপারে জড়িত হয়ে না পড়লে হয়ত আমি নিতান্ত বিব্রত বোধ করতাম।

অনেকক্ষণ বিমনা থাকবার পর এই সিন্ধী বণিকটির সঙ্গে বাদানুবাদের সময় লক্ষ্য করলাম, দ্বিতীয় বেঞ্চে উপবিষ্ট এই যুবতীটি অন্যমনস্কার ভান করলেও অধিকাংশ সময় আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে বাইরে বহুযোজনব্যাপী বিস্তারিত মাঠে দৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমি বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেই ওর দৃষ্টি ফিরে আসছে। ও ব্যাপারটা যে অনেকক্ষণ ধরে চলছিল সেটা আমি অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত বেশ তদুপরি গগলস আঁটা পাগল চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু আছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আমার ভুল ভাঙ্গল যখন আমার সুমুখের বেঞ্চে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসা পাগড়ী মাথায় একজন বৃদ্ধ ঘুরে বসে সোজাসুজি আমার সাথে পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না, তিনিই এই কন্যাদ্বয়ের পিতা। জ্যেষ্ঠা কন্যার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিম্বা সিন্ধী বণিকের অনুচিত বাদানুবাদে বিরক্ত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন—বোঝা গেল না

আমাদের আলাপটা অল্পেই জমে উঠল, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—আমি সত্যি বাঙালি এবং বাংলার বর্তমান খবর কি তাই শুনবার জন্যেই যে আমি ঠিক বাঙালি কিনা তারও পরখ হচ্ছিল সেটাও বুঝিয়ে বল্লেন। কলকাতার দাঙ্গার সংবাদ তখন সর্বত্র দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে—সেই সব কথাই তিনি বিস্তৃতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে গেল, আমাদের আলোচনা জাগতিক পরিস্থিতি হতে ক্রমে পারিবারিক আলোচনায় পর্যবসতি হয়ে গেল।

বৃদ্ধ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। আমার ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি খবর তিনি শুনতে চাইলেন, নিজের সম্যক পরিচয়ও জানালেন।

কলকাতায় কুড়ি বছর ধরে তিনি কয়লার কারবার করেছিলেন। যুদ্ধের গোলযোগে ওয়াগন অভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়। সংসারে তিনি একা, পুত্র সন্তান নেই, ওই দুটিমাত্র কন্যা। তাই আর ঝঞ্ঝাট না বাড়িয়ে কলকাতার বাস তুলে দিয়ে জন্মস্থান রাজকোটে চলে এসেচেন। এখানেই পৈতৃক বাস, বসত বাটি আছে। তা ছাড়া যা দু' চার পয়সা জমিয়েছিলেন তাতে রাজকোটে কয়েকখানি 'মকাম' খরিদ করে তারই ভাড়ায় দিন গুজরান করছেন।

মুস্কিল হয়েছে বড়ো মেয়েটিকে নিয়ে। ওর নাম কমলা। দুই বোনেরই জন্ম কলকাতায়। কিন্তু ছোটটি খুব ছোট থাকতেই এ দেশে ফিরেচে বলে এ দেশি ভাব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছে। পারে নি কমলা, পারে নি কারণ সে চায়নি। এ নিয়ে মাতা কন্যার অহরহ সংঘাত লেগে আছে। কলহে পিতা কোন পক্ষ নিয়ে থাকেন সেটা আভাসে বুঝলাম। বস্তুত কেবল কমলার নয়, তার পিতারও গভীর অনুরক্তি আছে বাংলার সংস্কৃতির উপর। বিশেষ করে ষোল সতের বছর ধরে মেয়েকে যে শিক্ষা ও আদর্শে মানুষ করেছেন সেটা পুরাপুরি বাঙালির আদর্শ। পরিষ্কার বলেই ফেল্লেন, কমলাকে কোন উপযুক্ত বাঙালির হাতে দিতে পারলেই তিনি খুসী হতেন, কমলাও সেটা নিশ্চয়ই পছন্দ করত। কিন্তু বাংলা হতে হাজার মাইল দূরে বসে এ স্বপ্ন তার নিরর্থক।

কমলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল আমাদের কথাবার্তা। শেষের দিকে পারিবারিক আলোচনা সুরু হতেই সে অন্যমনস্কের ভান করে নিজেকে দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু সে যে আদৌ অন্যমনস্ক নয় সেটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না।

আমি কাথিয়াবাড়ের গুণগান করলাম, বল্লাম যে দেশে বাপুজীর জন্ম হয়েছে সে দেশের সংস্কৃতিও তো তুচ্ছ করবার নয়।

বৃদ্ধ বললেন—কি জানো বাবা, দোষটা আমার। এই যে পাগড়ি এটা আমি এদেশেই পরছি, বাংলায় আমি বাঙালি হয়েই ছিলাম। আমার বন্ধুরা তোমার দেশের গণ্যমান্য লোক। আমি বাংলাকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি।

কমলা আমার সেই বাংলার ঘরে জন্মেছিল, সেই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, আমি ওকে বাংলার আদর্শ হতে বিচ্যুত করতে চাইনি, আজও যে মনে প্রাণে চাই তেমন নয়। ওটা যে কি জিনিস, সেটা তো জোর করে বোঝাতে পারব না। তুমি বাঙালি, বিদেশীর এই মনোভাব হয়তো তুমি বুঝবে না। তবু এটা সত্য। আমি জানতাম রবীন্দ্রনাথের বাংলা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাংলা, স্যার রাজেন মুখার্জ্জির বাংলা। সে বাংলাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব।

রাজকোট ষ্টেশন এলো। তারা সবাই নামলেন। আমিও নেমে বৃদ্ধকে নমস্কার করলাম। তিনি প্রতিনমস্কার করলেন। কমলাও পরিস্কার কণ্ঠে 'নমস্কার' জানালো। কিন্তু তার মুখে কিছুক্ষণ আগে দেখা হাসির জ্যোতিটি খুঁজে পেলাম না।

রাজকোট ছাড়িয়ে ভিরমগাম, সেখান হতে বোম্বাই, আমার ট্রেন কোন বাধা মানে নি। কিন্তু আজ কত দিন পরে বাডনরা জংসনের ওয়েটিং রুমের এই প্রায়ান্ধকারে আমার স্মৃতিকথা লিখতে বসে কমলার কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেদিন রাজকোট ষ্টেশন হতে ট্রেন ছাড়লে মনে হয়েছিল কয়লার ব্যবসায়ীর ঘরেই ভগবান কি হীরক পাঠিয়েছেন? আজ মনে হচ্ছে, সেদিন তার নির্বাক প্রশংসমান দৃষ্টি দিয়ে আমার হতশ্রী চেহারাকে উপলক্ষ করে এক বিমুগ্ধা নারী বাংলাকে, বাংলা ভাষার, বাংলা সাহিত্যের, বাংলার সংস্কৃতির আভিজাত্যকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, বোধ হয় এশিয়ায় সর্বপ্রথম

নোবেল প্রাইজ দিয়েও নোবেল কমিটি বাংলাকে সে সম্মান দিতে পারেনি। জানিনা কমলা কোথায়, বাংলার ঘরের বধূ হওয়ার আশা তার পূরণ হয়েছে কিনা, কিন্তু এই যে বৃহত্তর বঙ্গের প্রসার এতো চলবেই, আমরা সচেতন থাকলে কোনো প্রদেশের অন্যায় চাপেও এ প্রসার বন্ধ হবে না।

·×—

ছায়া

মণিকে দেখে চিনতেই পারিনি। নির্মোকমুক্ত সর্পও বুঝি চেনা যায়, কিন্তু এই মণিকে দেখে সেই মণি ভাবাই যায় না। এই মণির পায়ে তাল-তলার চটি, খাদি ধুতি ও পাঞ্জাবী, তার উপর একটা হালকা চাদর। হাতে খাদির ব্যাগে কাগজ পত্র। গান্ধীটুপিটা একটু কাত করে লাগানো। পুরাতনের মধ্যে আছে কেবল সেই সর্পিল কুটিল চোখ দুটি আর তার উপর শেলের চশমা জোড়া।

রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ দিদিমণিদের রান্নাঘরে সদ্য সদ্য ধোঁয়ায় চোখ লাল করে বেরিয়েছি। ভুষি মেশানো আটার ভাইটামিন-যুক্ত লুচি ক'খানা গোগ্রাসে গিলেছিলাম, এখন উঠে আসবার উপক্রম করছিল। অস্বস্তিতে ঘেমে উঠে বেরিয়ে আসছিলাম—আচমকা ধাক্কা খেলাম খাদিপরা ভদ্দর লোকটির সঙ্গে। তাকিয়ে দেখি—মণি। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর ব্যাকডোর ঘুরে বেরিয়ে আসতে আসতে সেও আচমকা থমকে গেছে।

কিন্তু আমাকে চিনতে তার কষ্ট হয়নি, কেননা আমার নির্মোক তেমনি অটুট আছে। আশিটাকার কেরাণীর যেমন চেহারা হ'য়ে থাকে, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, নেহাত বহুদিনের পরিচয়, তাই সামলে নিলে। রাগতে গিয়ে হেসে ফেললে।

আর হাসলেই তার সোনা বাঁধানো চারটা দাঁত দেখা গেল, যা দেখে তাকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হল না। বল্লাম—মণি যে, এই বেশে?

আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার অফিসে, ষ্টিফেন হাউসে। ওখানে একটা ফিল্ম কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সে। কোম্পানী খাড়া হয়েছে বছর চারেক, এখনো বাজার খারাপ বলে ছবি বের করেনি, আপাতত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তার মাসিক দর্শনী হাজার মুদ্রা আদায় করছেন।

এতো দিন চাল ছিল—খাঁটি বিলাতি সাহেবকে হারিয়ে দেওয়া লণ্ডনী সজ্জা। র‍্যানকেনের বাড়ীর স্যুট ছাড়া সে পরেনি। সেই মণির এই দুর্মতি! কার্থবার্টসন্ হার্পার ছেড়ে তালতলার চটি, র‍্যানকেন ছেড়ে রাইমোহনের বিশুদ্ধ খাদি! কি জানি কি ঘটল।

জিজ্ঞাসা করলাম। বাল্যবন্ধু, একসাথে পাতা লিখেছি, একসাথে বি-এ অবধি পড়েছি। তারপর আমি গেলাম এম-এ আর ল একসাথে ঘসতে আর ও ফট্ করে ঢুকে পড়লো একটা মার্চেণ্ট অফিসে। তারপর দুজনের দেখা হয়েছে, মিলতে পারিনি। আমাদের ব্যবধান বিস্তর। কিন্তু ওই যে ছোটবেলায় একসাথে পাতা লিখেছিলাম সেই কথাটি মণি ভোলেনি আজো। আশ্চর্য, কঠিন গিরিগাত্রে যেমন ক্ষুদ্র প্রবাহ লুকিয়ে থাকে, মণির মতো মানুষের মনেও আছে তেমনি দুর্বল ঠাঁই।

আমি বল্লাম, কি হল হে, একেবারে স্বরাজ পাওয়া চেহারা বানিয়েছিস। মণি বল্লে,—আস্তে। কেরাণীরা শুনতে পাবে। তুই একটা আস্ত গাড়োল, নতুবা কি দেখতে পাচ্ছিস না—কি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে। বাংলা ভাগ হয়ে গেছে, কংগ্রেসী শাসন চালু হয়ে গেছে। ছায়া মন্ত্রীরা কায়া গ্রহণ করেছে, আর তুই ঘুমুচ্ছিস? এখন একটু চোখ কান খুলে চল দিকি, দেখবি···

চুপি চুপি অনেক পরামর্শ শুনলাম। আমি এসে মণির সহায়তা করলে আমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জল সেটা সে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও

এক কাপ খাঁটী স্বদেশী চা সেই পুরাতন বিলাতি কাপেই অধঃকরণ করে উঠে এলাম।

ছায়ার মরীচিকা দেখছি সুমুখে, বাংলার ভবিষ্যৎ যাদের হাতে তাদের পিছু পিছু লম্বমান এ কি দীর্ঘ ছায়া! ওই দলে ভিড়ে পড়ব নাকি?

তীর্থ যাত্রা

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে তীর্থস্নান লাগি' পড়েছিলাম অল্প বয়সেই। মনে হ'ত মোক্ষদা মুর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী তাই শিশুপুত্র নিয়েও গেল তীর্থস্নানে। বস্তুত কী মোহই বা থাকতে পারে তীর্থস্নান ও তীর্থ দর্শনের?

কিন্তু সত্যি কি কুসংস্কার, কেবল মোহান্ধতা? কিছু কি নেই তীর্থস্নানে? আমার শিক্ষার মোহই কি সকল কুসংস্কারের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছে নিজেকে। বিশ্বাস হারিয়েছি, অন্ধ ভক্তি আর অটল বিশ্বাস, যার ফলে শিলা হয় শিব, নুড়ি হয় নারায়ণ, বৃক্ষ হয় বোধি আর কূপ হয় কুণ্ড।

শৈশবের কথা মনে পড়ে। বোশেখ মাস পড়তে না পড়তেই নতুন পঞ্জিকার পাতা খুলে হাতড়াতে থাকি জগন্নাথের রথযাত্রার তারিখটা দেখে নিতে। আমাদের গাঁয়ের ক্রোশ আস্টেক পূবে লাউপালা গ্রাম, সিদ্ধ পুরুষ বালকদাস বাবাজীর প্রাচীন আখড়া আছে সেখানে। জগন্নাথের রথযাত্রায় সেখানে উৎসব হয়, মেলা বসে। দেশ বিদেশের সওদা নিয়ে আসে সওদাগর; কাঠের বেসাতি, মাটীর শানকি, সস্তা মনোহারী জিনিষ, তা ছাড়া ধামা কুলো, হাতা বেড়ী, চাল ডাল, তেল কেরোসিন এমন সাত সতের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আমদানী হয়। আরো আসে ফুকন মুচি ঢোলক

ছাইতে, রতীন নাপিত দাড়ি কামাতে এবং আশ পাশের গাঁয়ের লোক রথ দেখতে আর কলা বেচতে।

আমাদের গাঁ হতে ছেলেমেয়েদের দল ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় চেপে বসে অভিভাবকদের সাথে। মুসলমান মাঝি সোৎসাহে নৌকা বেয়ে নেয়, তারো আনন্দ কম নয়, কেননা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢোকেনি তখনো তার মগজে। মেলায় পৌঁছে সেও বিবির জন্য কাঁকুই কেনে, ছেলের জন্য ঝুমঝুমি। গন্ধতেল নিতে পারলে পুঁটী মেয়েটাকে খুশি করা যায়, ভাবে মাঝির সাকরেদ সওগাত আলী। ছোঁড়ার উৎসাহের শেষ নেই। টিপি টিপি বৃষ্টি, ভরা নদী কুলে কুলে টলমল করছে, চরের ধানবনের মধ্যে জল উঠেছে হাঁটু অবধি। হেলে সাপ দেখলে লগি উচিয়ে তেড়ে উঠছে সওগাত। ঝুঁকে পড়েছে নদীর উপর যজ্ঞডুমুরের ডাল, ঢোল কমলির লতা বিছানো, ফুল ফুটেছে বিস্তর। ও ডুমুর গাছের তলাটার দিকে তাকিয়ে গা শিউরে ওঠে। ওখানটা অন্ধকার, মেঘলা দিনের আবছা আলোতে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু ওই যজ্ঞডুমুর গাছের বাসিন্দাটি অপরিচিত নয় একথাটা মনে মনে চিন্তা করতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকা বেয়ে চলে। কখনো চেপে বৃষ্টি আসে, কখনো কমে। গলুইয়ের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে কচুড়ির ফুল তুলছে আমার দিদি খেন্তি আর নন্তুর দিদি মণিমালা, ছোট নৌকা তাতেই টলে ওঠে, সবার চোখ পড়ে সেদিকে।

দু'একখানা নৌকার সাথে সাক্ষাৎ হয়, তারা ফিরছে রথের মেলা হতে। বাজছে বাঁশের বাঁশী, টীনের ঝুমঝুমি, বেতের ঢোলক এবং কাঁসার খঞ্জনি। লাল ঘোড়া আর সাদা গরুর মৃণ্ময় মূর্তি উকি মারছে নতুন বেতের ধামা হতে। সখ করে কিনেছে কে বেতের মোড়া, কাঠের পিঁড়ি। বাবা সেগুলির দাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নজর রয়েছে সেই ধবলী গাইটীর দিকে। গরু আমার ভারি ভাল লাগে। গরুর গায়ের কেমন মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, 'মা' বলে কেমন পরিষ্কার করে তার বাছুরকে ডাকে। বাছুরটিকে আদর করলে গরুর

চোখেও আনন্দ দেখা যায়, গলকম্বলে হাত বোলালে চোখ বন্ধ করে থাকে। আমাদের বাড়ীর রাখাল ষোলোদা, তার ভালো নাম কি জানা নেই, ডাক নাম ষোলো, সেও যাচ্ছে রথে আমাদের সঙ্গে। তার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করি, অমন গরু চাই এক জোড়া। ষোলোদা পরামর্শ দেয়, ছোট-কর্তাকে বলো না কেন তুমি। ছোটকর্তা মানে আমার বাবা, যিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।

কত প্রতীক্ষার পরেই যে রথের মেলার অভাস মেলে। চোখে কিছুই দেখা যায় না তখনো, শুধু কেমন একটা গুঞ্জন ধ্বনি, যেটা নৌকার তলায় জলস্রোতের ছলছলাৎ শব্দ, তীরের মোলি ঘাসের ঘস ঘস শব্দ ছাপিয়েও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষে দেখা যায় উঁচু মাস্তুল তোলা পশ্চিমি কাঠের নৌকার বহর। ছোটখাটো একখানা ঘরের মত বৃহৎ, ওর অন্দরে যে কী রহস্য লুকানো আছে জানতে ইচ্ছা করে।

মাঝিরা রান্না চাপিয়েছে, কেউ কুটনা কুটছে, বাটনা বাটছে কেউ। তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ হয় যে বেচারারা মেলার আনন্দ সুমুখে রেখেও নৌকার গলুইয়ে বসে রান্না করছে। তার মধ্যে আমার বয়সী একটা ছেলে মুখ ভার করে বসে আছে। বেচারী নিশ্চয় আজ পড়া পারেনি বা অমনি কোনো অপরাধ করেছে তাতে আমার কোন সন্দেহ থাকে না।

নৌকা হ'তে নামলে হাঁটু সমান কাদা। বহুলোকের যাতায়াতে, আষাঢ়ের ঘন বর্ষণে সে কর্দম মর্দিত হচ্ছে, মাখমের মত মোলায়েম মনে হয়। কাছা সামলাতে গেলে কোঁচা কাদায় পড়ে যায়, দিদির আঁচলে লেগে গেল এক লেপ।

সবার আগে ঠাকুর বাড়ী যাওয়ার আদেশ। রথতলার সুমুখে প্রশস্ত পুকুর, পাড় বাঁধানো। পা ধুতে নেমে পিছলে পড়ে গেল কত জন। অদূরে একটা বড় বকুল গাছ, তার পাতা ঝরে পড়ছে।

বাবা উঁচু করে দেখালেন জগন্নাথ সুভদ্রা প্রভৃতির মূর্তি, বালকদাস বাবা-

জীর পূজিত জাগ্রত বালগোপাল মূর্তি। হাত পেতে চরণামৃত নিলাম। শিব মন্দিরে যেয়ে প্রণাম করে এলাম। আমার মন পড়ে আছে মেলার দিকে, যেখানে ধবলী গাই কিনতে হবে এক জোড়া, লাল ঘোড়া চাই একটা, দিদির কালো ফিতে। আমার ঢোলকের খোলটা আনা হয়েছে, সেটা চামড়া ছাইয়ে নিতে হবে। আরো কত কিছু আছে। এখানে না এসে আগে ওখানে গেলেই ভালো হোতো। তেষ্টা পেয়েছে বলে সেই কলের জল কিনতে হবে এক বোতল। বোতলের মধ্যে সে জল টগবগিয়ে ফুটতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যি একটুও গরম নয়। গত বছর মেলায় আমরা খেয়েছিলাম। মা তো আমার মুখে শুনে বিশ্বাসই করতে চান না। পরে বাবা বুঝিয়ে বল্লেন,—সোডাওটার না কি, তখন মায়ের বিশ্বাস হয়।

এ সব কথা এখনো আমার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে আমাদের পাঠশালার পণ্ডিত প্রতাপ মাষ্টার মশাইয়ের কথা। গ্রামে তাঁর নাম প্রতাপ মাষ্টার। পরম ভক্ত বৈষ্ণব সাধক। তাঁর মুখে শুনেছিলাম আশ্চর্য ঘটনা। আমাদের গ্রামের পাশে নলধা গ্রামে একজন চিকিৎসক বৈষ্ণব সাধন ভজন নিয়ে এতই ব্যাপৃত থাকতেন যে চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশী সময় দিতে পারতেন না। ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই যখন তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হল, দুটি শিশু পুত্র—নাম নিতাই ও গৌর, তাদের মায়ের যত্নে মানুষ করতে লাগলেন। তবু আবার বিয়ে করে সংসারে মন দিলেন না। দৈবক্রমে তাঁর একটী পুত্র মারা গেল, তবু তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস কমল না। কনিষ্ঠ পুত্রটিকে নিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েও তিনি ধর্মাচরণ করে চল্লেন। শেষে সেও ফাঁকি দিয়ে গেল।

এদিক তাঁর বয়স বেশী হয়ে পড়ল, শরীর রোগজীর্ণ; তবু ধ্যান ধারণা পূজা অর্চনা সমানেই চলছে। সেবারেও বর্ষশেষে ক্রমে নববর্ষ এবং আষাঢ়ে জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিন এসে পড়ল। বরাবর তিনি এমন দিনে ফুল ফল সংগ্রহ করে নিয়ে লাউপালা যান, এবার কিন্তু তাঁর দেহ বার্ধক্যে অশক্ত, রোগে

জীর্ণ। পরন্তু পরিচর্যা অভাবে বহির্বাটির পুষ্পবাগ জীবন্মৃত হয়ে আছে। বরাবর এমন সময় কদম্ব গাছটীতে দুএকটী ফুল ফোটে, এবার কয়েকমাস আগেই সে গাছটী শুকিয়ে উঠেছে। রাত্রে শুয়ে তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন,—গোপাল, এবার কি তুমি আমার হাতে কোন ফুলই নেবে না? জগন্নাথ, তোমার স্নানযাত্রায় এবার কি কোন মালাই দিতে পারব না? ভাবাবেশে তিনি অশ্রুপাত করতে করতে নিদ্রিত হলেন। স্বপ্ন দেখলেন, মৃত কদম্ব গাছে অজস্র ফুল ধরেছে।

প্রত্যূষে জেগে আবার তার সেই চিন্তা জাগল, কি ফুল নিয়ে যাবেন। কিন্তু বাইরে এসে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না, সত্যি সত্যি সেই কদম্ব গাছ মঞ্জরীত হয়ে উঠেছে, ফুটেছে কদম ফুল, ফুল নিয়ে তিনি মাষ্টার মশাইয়ের সাথে রথ দেখতে গেলেন।

জানি না ঘটনাটি সত্যি কিনা, কিন্তু যে রথের মেলায় মাটির গরু আর সোডাওয়াটার আমার শিশু চিত্তকে আকর্ষণ করত, সেই তীর্থের জন্ম ভক্তের বাগানে শুকনো গাছে ফুল ফুটে উঠতে পারে এ কথার মধ্যে যে গভীরতর কিছু ইঙ্গিত আছে এ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

পরে বড় হয়ে কলকাতার কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, নবদ্বীপ, কামাখ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর—কত তীর্থে গেছি, পথে বেরিয়ে ছোট বড় মন্দির, আশ্রম, তপোবন, গুহা, নদীতট, প্রান্তর, মরু-মেরু উৎস, প্রবাহিনী কত কিছু দেখলাম। সন্ধান করে চলেছি সেই তীর্থের যেখানে গেলে মনে ধরা দেবে কোন অগোচর বস্তুর অনুভূতি, যার সূক্ষ্মতা হয়ত বুদ্ধির চিক্কণতায় বিচার করা যাবে না, কিন্তু যার সৌরভ হৃদয় পূর্ণ করবে। কত কুণ্ডে স্নান করেছি, উৎস হতে বারিবিন্দু চরণামৃত জ্ঞানে গ্রহণ করেছি, তীর্থে তীর্থে সতীর্থের ভীড়ই দেখে ফিরলাম যারা হয় আমার মত ঘোর অবিশ্বাসী না হয় নিতান্ত তামস-কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

নাসিকে এসে সীতাগুম্ফায় নেমে দম বন্ধ হয়ে এলো, পঞ্চবটীতে কোন

পৌরাণিক আবহাওয়া পেলাম না। তপোবনের তিন্তিড়ি বৃক্ষচ্ছায়া গোদা-বরা ও কপিলা সঙ্গম, সুর্পনখার নাসিকা ছেদন এবং মারিচ বধের স্থান, গোদাবরী গর্ভে অগুণতি কুম্ভের মধ্যে দিন দিনান্ত ঘুরে বেড়ালাম, মনটা কেবলই দুলতে লাগলো দ্বাপরে কলিতে। যুগ যুগান্তে মানুষের মনেও কি পরিবর্তন নেই? ত্র্যম্বকেশ্বরে কুশাবর্তে স্নান করে কিছু মাত্র তৃপ্তি পেলাম না। গেলাম ব্রহ্মগিরি গোদাবরী উৎসমুখ, গোরখনাথ, একনাথ মন্দির নীলগিরি দর্শনে। কিন্তু পথকষ্ট ব্যতীত কিছুই তো দেখিনে। পিচ্ছিল শৈল সোপান হতে পা পিছলে পড়লাম দুর্বল বঙ্গসন্তান আমি, কাছা-আঁটা কোমলাঙ্গি এক মারাঠিনী যুবতী এবং দীর্ঘদেহ বিশাল বক্ষ একজন পাঞ্জাবী সৈনিক। কারো চোখে জল নেই, মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি নেই, অপরূপকে প্রাপ্তির এক অসীম তৃপ্তি নেই। পাহাড়ের চড়াই উতরাইএর শ্রমে কাতর, কেহ বা তরুণী সঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণের মিথ্যা প্রয়াসে বৃথা যত্নবান এবং দ্বিপ্রাহরিক ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার্য সংগ্রহের পরামর্শে তৎপর। অবিশ্বাসী দর্শকমাত্র আমরা গড্ডলিকা প্রবাহে পিচ্ছিল সোপান বেয়ে নেমে চলেছি। পাশে পাশে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে প্রত্যাশী শাখামৃগ, ভিক্ষার্থী পাহাড়ী ছেলেমেয়ে আর আমাদের অগোচরে আমাদের কুশিক্ষার দুষ্ট ছায়াও মুখ ভাংচাচ্ছে কিনা কে জানে।

নতুবা কিসের টানে ভোজপুরী বৃদ্ধা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে উপরে, ডুলিতে বসে ঢুলছে শোলাপুরী বর্ষীয়ান বণিক।

ত্র্যম্বকেশ্বর ছেড়ে নাসিকে ফিরে যেতে চাই, যেখানে বিজলীর বাতি, সিনেমার বাজনা আর মোটরের কোমল আসন প্রস্তুত আছে। নাসিক সিটী হতে নাসিক রোড ক' মিনিটের রাস্তা। সেখানে আছে লোহা বাঁধানো সড়ক, সেখানে হাজার পায়ে ছুটে যায় কলকাতা বোম্বাই দিল্লী আগ্রার ডাকগাড়ি, গ্রাম মাঠ মন্দির মসজিদ, পাহাড় বন নদী পেরিয়ে তীর্থ হতে তীর্থে হুইসিল বাজিয়ে মত্ত তুরঙ্গের মতো। ওর সওয়ার হয়ে আমাদের জীবন ছুটে চলে, ছিটকে পড়ে প্রদেশে প্রদেশে। দেশে দেশে যার জয়যাত্রা

সাগর মরুমেরুর ওপারে, হয়ত বা কবে যাবে নক্ষত্রলোকে ঝাঁপিয়ে। কিন্তু ওই যে বটের পাতা ঝির ঝির করে নড়ছে, কুলু কুলু বয়ে চলেছে স্রোতস্বতী গোদাবরী, কপিলা, পাখী ডাকছে আপন মনে, কান খাড়া করে শুনছে বন্য মৃগ, নীল গাই। কামধেনু লেহন করছে স্তন্যপায়ী বৎসের গাত্র। আর সেই স্নিগ্ধ তপোবন তীর্থে এসে পৌছিল ব্রহ্মচারী নবীন সন্ন্যাসী, হিমালয় হতে কুমারিকা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে সে এসে পৌচেছে ভারতের মর্মবাণীর সন্ধানে। যার ধ্যানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পরম সত্য, বট হ'ল বোধি। সেই স্থৈর্য আমাদের কৈ, কৈ সে তীর্থ সন্ধানের আকুল আকুতি? কোথায় সেই তীর্থঙ্কর?

-:-০-:-

চন্দ্রনাথ

শাদা মাটির পথ বিরলবসতি মাঠের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের দিকে গিয়েছে। পথ ধরে চলেছি চন্দ্রনাথে। ইষ্টিশানে শুনে এসেছি ধর্মশালা আছে মহেশ ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যবসায়ী, হিন্দুর এই বহুবিখ্যাত ধর্মস্থান চন্দ্রনাথে তীর্থযাত্রীর সুবিধার জন্য প্রশস্ত ধর্মশালা স্থাপন করেছেন, খনন করেছেন একটা ছোটো খাটো হ্রদ। তার দুপাশে পাকা সিঁড়ি, কাকচক্ষু জল দূর থেকেই তৃষিত তাপিত পথিককে আহ্বান করতে থাকে।

আমাকে যিনি আহ্বান করলেন তিনিও দীঘিটির মতই পরিপূর্ণ, তেমনি কালো গভীর চক্ষু, বিপুল এলো খোপা আর ঈষৎ দুলে ওঠো জলের মত তরঙ্গময় তার শাড়ী সুপুষ্ট বক্ষ বেষ্টন করে স্কন্ধে আশ্রয় নিয়েছে।

আহ্বান ঠিক করেন নি, আবার একেবারে করেননিই বা বলি কি করে। পথ যেখানে বাঁক ঘুরেছে সেখান হতে ধর্মশালার দীর্ঘ টিনের চালাটা

চোখে পড়ে। সামনের দিকে খানিকটা খোলা জমি, তুপাশে ক'খানি কুটির, পাহাড়ী সরু বাঁশের চটা দিয়া সীমানা ঘেরা, সেই বাঁশেরই বাঁকানো গেট,. তারই অদূরে দীঘি, সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। প্রশ্ন করলাম, ধর্মশালাটী কোথায় বলতে পারেন ?'

'এটাই'—

সানন্দে এগিয়ে এলাম। হাত উঁচু করে দেখিয়ে দিলেন, টিনের শেডের দেওয়ালে বড় বড় হরফে লেখা আছে "গিরিশ ধর্মশালা।" ওটা আগে চোখে পড়ে নি। তাই হেসে বললাম; এমন ধর্মশালায় বাস করতে লোভ হয়।

লোভ হওয়া বিচিত্র নয়, বেশ চমৎকার পরিবেশ। এই খোলা মাঠ, এই খোলা দীঘি, ওই উঁচু পাহাড়, গভীর নীল বন।

ততক্ষণে আমরা এসে পড়েছি ঘরের সুমুখে। তিনি বল্লেন—দেখুন না, কি চমৎকার পরিবেশ, কি সুলভ ধূলা, মেঝেতে কি কঠিন বাঁশের পাটি!

অপরিচিত পুরুষের সুমুখেও তাঁর চমৎকার হাসিটি বাধা মানল না।

তাঁর বাবাই হবেন তিনি, এগিয়ে এসে বল্লেন, এই এলেন বুঝি, আসুন আসুন মশাই। আমাদের বাঁচালেন। অসময়ে এসে পড়েছি ছেলে পিলে নিয়ে। এসে দেখি একটি যাত্রীও নেই, সারা ধর্মশালা খাঁ খাঁ করছে। ম্যানেজার মশাই আবার রিপোর্ট শোনালেন, কাল রাতেও নাকি বাঘের ডাক শুনেছেন সুমুখের পথে। শুনে তো রেখার মা এখুনি ফিরে যেতে চাইছেন, ট্রেনও আবার সেই রাত্তির বারোটায়। চাঁটগায় ফিরে যেতে দেড়টা বাজবে।

নামটা শোনা গেল—রেখা। তার ছোট ভাই অসিত আর তার ছোট বোন রমলা অদূরে করবী গাছের নীচে ঘন ঘাসের উপর ফুল কুড়িয়ে খেলা করছে। তাদের মা ঘাটে নেমেছেন।

আমি অভয় না দিলেও ভয়টা যে তাদের কমেছে তাদের চোখে মুখেই

তা দেখা যাচ্ছে। বিকাশ বাবু গল্প করতে বসলেন, আর রেখা ষ্টোভ জ্বেলে চা করছে। আমি আমার ঝোলা ঝুলি কুলুঙ্গিতে তুলে বললুম, আমি একটু পাহাড় ঘুরে আসি। সমতল দেশের মানুষ, পাহাড়ের ঢেউ খেলানো রাস্তার আকর্ষণ কাটানো কঠিন।

বিকাশ বাবু বল্লেন, সেটা কি একা আপনার? আরে বসুন বসুন। কেবল এলেন, বিশ্রাম করে চা খেয়ে তার পর সবাই যাব চলুন।

রেখার চোখটিও ঘুরে গেল আমার দিকে, তার বাবার মত সমর্থন করা চাহনি। হাফপ্যাণ্টটা না পরা থাকলেই বোধ হয় স্বস্তি অনুভব করতাম। কিন্তু এখন না বসেই বা উপায় কি?

চা হ'ল, খাবার বেরুল, রেখার মা গুছিয়ে দিলেন, রেখা সবাইকে পরিবেশন করলে। শক্ত বাঁশের চাটাই পাতা এক হাটু ধূলার উপর, তার উপর একটা সতরঞ্চি বিছানো, সেখানে বসেই আমাদের চা-পর্ব সমাধা হ'ল। ওরই মধ্যে রেখা আর তার মা একটু কাপড় চোপড় গুছিয়ে এলেন, রেখা তার ভাই বোনদের প্রস্তুত করে নিলে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সাথে পাণ্ডা নেই, আর এটা ঠিক পূজা অর্চনার সময়ও নয়। পূজা হয়ে গেছে সকালেই, মন্দিরে মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ, দেবতা সুপ্ত হয়েছেন, মিছে দুয়ারে মাথা কোটা, পথে পথে ঠোক্কর খেয়ে পাহাড়ে অধিরোহণ। ধর্ম-শালার ম্যানেজার মশাই আমাদের নিরুৎসাহ করতে চাইলেন। কিন্তু আমি সম্মত হলাম না চুপ করে বসে থাকতে। পাতার পর পাতা খুলে রেখেছেন যিনি পাহাড়ে-প্রান্তরে, নীল অরণ্যে, প্রাচীন অট্টালিকায়-মন্দিরে, চোখ ভরে তা দেখে প'ড়ে নেওয়ার লোভ কি কম! পড়তে যারা জানে তাদের কাছে কাব্যের রস কি কেবল কবির প্রতিকৃতিতে অবলুপ্ত থাকে? ছন্দের ঝংকার, শব্দের মাধুর্য, ভাবমন্দাকিনী তো কবির সমগ্র সৃষ্টিতেই ওতপ্রোত ভাবে ছড়িয়ে আছে। বিকাশ বাবু অস্বীকার করতে পারলেন না কথাটা।

সমতল ছাড়িয়ে একটু উঠতেই বেজে উঠলো অদ্ভুত অভ্যর্থনার সুরে

পাহাড়ী ঝিঁঝিঁর ডাক। দুপুরের রোদ ঝিমিয়ে এসেছে গাছের গভীর ছায়ায়। পাহাড়ে ফাটলের কাছে ঝিঁঝিঁ তারস্বরে ঐকতান সুরু করেছে। করবী, টগর, বেল, জবা, আর কাঠমল্লিকা ফুলের বৃষ্টি হয়ে গেছে পথে পথে।

অসিত কুড়িয়ে নিয়েছে মুড়ি, রমলা কুড়িয়ে নিয়েছে ফুল, রেখা একমুঠি বালি মাখা মাটি একটা গুহার মুখ হ'তে। বিকাশ বাবুর বাত, তাঁকে সঙ্গী করতে যেয়ে আমাকেও বাতে ধরে ধরে অবস্থা। রেখার মা মাঝে মাঝে না বসে পারছেন না। চাকরটিকে সুখে ঘরে বসিয়ে রাখবার জন্য কিছুক্ষণ হ'তেই তিনি অনুযোগ সুরু করেছিলেন, কিন্তু যাদের জন্য অনুযোগ সেই রমলা বা অসিত তো তার আগে আগেই চলছে বরাবর। বিকাশ বাবু এবার বলে ফেল্লেন, রজনী না আসায় দেখি অসুবিধা হচ্ছে তোমারই সব বেয়ে বেশী। সে এসে কি তোমায় কাঁধে করে তুলে নিত?

রেখার মায়ের নামটা জানি না, নিস্তারিনী হ'লেও নিন্দনীয় হয় না। কেননা বোধ হয় আমার উপস্থিতির জন্যই তিনি কেবল দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করে স্বামীকে নিস্তার দিলেন।

সত্যই আমাদের মত সমতল দেশের মানুষের চড়াই উতরাই করতে কষ্ট হয়, বিশেষত যারা সুখে লালিত এবং মেদবাহুল্যে দৈহিক ওজন নিয়ে হিম-সিম খান। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা জানি না, কিন্তু মনে হয় এই সহজ ব্যায়ামের সুবিধা থাকলে অনেক মেদবহুল মানুষ তাদের বাড়তি ওজনের বিড়ম্বনা হতে রক্ষা পেতে পারেন।

অসংখ্য ছোট ছোট বেলের চারা, বন শিউলীর গাছ, লজ্জাবতী লতার ঝোপ, আম আদা পথের পাশে, মন্দিরের আনাচে কানাচে। জ্যোতির্ময় ও সীতাকুণ্ডের কাছে গেলাম। যায়গাটি সমতল হতে অল্প দূরে, উঁচু পাড় হতে খাদ নেমেছে ঢালু হয়ে। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, সামনে ছোট্ট চৌবাচ্চার মত কুণ্ড। তিনটী ভেক বুঝি তীর্থস্নানে নেমেছে। আমাদের দেখে কিছুমাত্র বিরক্ত হ'ল না।

আমরা কুণ্ড দেখছি, রেখা মন্দিরের পিছন হ'তে চীৎকার করে উঠল। ছুটে যেয়ে দেখি পাহাড়ের গায়ে মাটির কোলে ছোট্ট সুড়ংগ, সেখান হতে কোন অজগরের জিবের মত লকলকে, সরু শিখা বেরিয়ে আসছে। দৈব শক্তির জাজ্বল্য প্রমাণ। এ যুগের বিজ্ঞানী মন দেখবে শিখার বর্ণ, সেটার মূল ধরাও কঠিন নয়। পৃথিবীর গহ্বরে যে কত কিছু জমে আছে, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও যার ক্ষয় সম্পূর্ণ হচ্ছে না, বিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম বিচার তার হদিস খুঁজে বের করেছে। এখন তাই আর এই শিখাকে দৈবশক্তির জাজ্বল্য প্রমাণ বলে মেনে মন খুশী হয় না। রেখার উল্লাস সংক্রমিত হল তার ভাই বোনের মধ্যে। তারা কাঠ খড় কুড়িয়ে শিখায় আহুতি দিতে গেল। তাদের মা গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলেন। বিকাশ বাবুও আমার অলক্ষে ছড়ি শুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে জাগ্রত শক্তিকে প্রণাম করলেন। আমি চেষ্টা করে অন্য দিকে চেয়ে রইলাম।

ওই শিখা জ্বলছে স্বয়ম্ভূনাথ মন্দির চত্বলে একটী জীর্ণ পরিত্যক্ত শিব মন্দিরের ভগ্ন সোপানেও। সে শিখা আরও ব্যাপক, আরো উজ্জ্বল। রেখার চোখে মুখে তার আভা ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা ছবির মত মনোহর। দেবতার মন্দির দ্বার রুদ্ধ, বাইরের প্রণাম াক তিনি দেখতে পেলেন না ?

এই চত্বল ছাড়িয়ে পথ উঠে গেছে উপরে, এঁকে, বেঁকে, খাদের পাশ দিয়ে, ইট, কাঠ, কংক্রিটের সিড়ি বেয়ে, জলের পাইপ পাশে নিয়ে নিয়ে, মাঝে মাঝে জলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে বসিয়ে। বেশ খানিকটা দূরে এলে একটা বিশ্রাম মন্দির। সেখানে সবাই এসে বসে পড়লাম।

জিরিয়ে জিরিয়ে এসে পৌছলাম বিরূপাক্ষের মন্দিরে। যারা জল খাবার ইচ্ছা করলেন তাদের জল দিতে পারা গেল না, আনা হয়নি সাথে। বিরূপাক্ষ-দেবের মনটা উদার, পুরোহিত মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করতে কসুর করেননি, কিন্তু সে কেবল লোহার গরাদ মাত্র। আমাদের অদৃষ্ট বিরূপ নয়, তাই দেবদর্শন

হল। রেখাকে তার মা ভালো করে প্রণাম করালেন, শিবের মত স্বামী পাওয়ার জন্য কিনা জানা গেল না।

মন্দিরের আর দিক দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। এখান হতে আরো খানিকটা উঁচুতে আর এক শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির। সেটাই আমাদের যাত্রার লক্ষ্য, উদ্দেশেই রেখার মা বারকয়েক করযোড়ে প্রণাম করলেন।

চড়াই উৎরাই করতে করতে চন্দ্রনাথের দিকে চলতে সুরু করলাম। চড়াই বেশী। মাছে মাঝে বেশ খাড়াই পথ। মোটা মানুষ রেখার মা, আহা যদি তার কিছু সহায়তা করতে পারতাম, তীর্থ যাত্রার সত্যি পুণ্য হতে পারতো। কিন্তু আমি এগিয়ে গেলেও তিনি ঠিক অকুণ্ঠচিত্তে আমার কোন সহায়তা নিতে চাইবেন ভরসা হল না। হাজার হোক, যতক্ষণ বাঘ সত্যই এসে না পড়ছে, ততক্ষণ তো আমি পথের মানুষ ছাড়া আর কেউ নই। চলেছি এগিয়ে সবার আগে আগে, তাতে তিনি খুশী। বাঘ যদি সত্যি আসে, তাঁর স্বামী বা সন্তানদের পাওয়ার আগে আমাকেই পাবে তাতে তাঁর আশ্বস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুজন মিলিটারী পাঞ্জাবী ব্যতীত আর তৃতীয় জনপ্রাণীর দেখা পাইনি।

খাড়া পথে উঠে চলেছি। উপরে উঠে পথের এমন বাঁক ঘুরে গেছে যে এখান থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার পিছনেই তর তর করে উঠছে রেখা, স্বাস্থ্যসম্পদে সে বিপুল বনশ্রীর মত ঐশ্বর্যময়ী। শ্রমে মুখ আরক্ত, চূর্ণ অলক বেয়ে ঝরছে ঘাম, নিশ্বাসও পড়ছে দ্রুত তালে। সত্যি সে কি শ্রান্ত বোধ করছে ?

উপরের সিঁড়ির উপর বসে নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম সেই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আমাদের ছোট দলটী অনেক পিছিয়ে পড়েছে। রেখা প্রায় উঠে হাত বাড়িয়ে বল্লে ; একটু টেনে তুলুন।

ঘর্মাক্ত কোমল হাত আমার হাতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলো। অনেক পরে এলেন তার বাবা, মা আর ভাই বোন।

আর বেশী দূর নয়। প্রত্যেক বারই মনে হয়, এইবার নিশ্চয়ই মন্দিরে পৌছে যাব। ঘড়িতে দেখছি, এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট চলেছি। পথ কত-টুকু, সমতল হলে কতদূর চলে যেতে পারতাম।

রেখা বল্লে, পাহাড়ে ওঠা মায়ের কর্ম নয়। কাল আর তিনি আসছেন না।

আর আপনার বাবা? তিনি তো বাঘের ভয়ে অস্থির—বললাম আমি।

রেখা বল্লে, বাঘ কি আর এই পাহাড়ে আছে?

কে বলতে পারে সত্যি এ পাহাড়ে বাঘ আছে কিনা? ওই তো অনেক দূরে নিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড়, ঢেউয়ের উপর ঢেউ, নীল অরণ্যের সমারোহ অনেক দূর আচ্ছন্ন করে রয়েছে। কি রহস্য আছে ওই অচেনা অরণ্যে কে জানে? কে জানে কোন্ কাপালিকের আশ্রম ওরই কোনও প্রস্তরগুহায় প্রচ্ছন্ন আছে কিনা?

আর একটা খাড়া পথ বেয়ে উঠে দেখি, পথের পাশে জটাধারী রক্তবসন বসে আছেন একজন, তাকে কি সন্ন্যাসী বলবো, না কাপালিক ভাববো? লক্ষ্য করলাম, তার দৃষ্টি পড়েছে আমাকে ছাড়িয়ে আমার পিছনে, যেখানে আমারই কাছে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে রেখা। তার মুখে আর হাসি নেই। ভয় না হ'ক, নির্ভয়ের ছবিও সে নয়। আমার হাতটা সে ধরে ফেলে। কিন্তু ততক্ষণে জটাধারী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে,—কিছু ভিক্ষা, পুণ্যস্থানে এসে কিছু দান করে যান!

মনটা কঠিন হয়ে গেল। এখানে এসেও সেই ভিক্ষা। ১৩৫০ সালে যারা বেঁচে ছিল, যারা সহরেও ছিল তারা এই হাত পাতা দেখেছে। বাংলার সেই প্রসারিত হস্ত আজ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে বাংলার বুকে।

কিন্তু এতো ঠিক সেই ভিক্ষা নয়, এযে ভান, ধর্মের নামে প্রতারণা, মানুষের দুর্বলতার উপর ব্যবসাদারী।

রেখা আমার হাতে মৃদু টান দিয়ে হাত ছেড়ে দিলে। নিরুত্তরে এগিয়ে

গেলাম। জানি না আমাদের পশ্চাতে বিকাশ বাবু ও তাঁর স্ত্রী এই সহজ পুণ্য অর্জনের লোভ সম্বরণ করেছিলেন কিনা।

মন্দিরটা দেখতে পেয়ে ছেলে মানুষের মত রেখা ছুটে গেল,—আমি আগে পৌঁচেছি চন্দ্রনাথে। তার ভাই বোনেরা নিকটে থাকলে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে বিলম্ব করত না। কিন্তু আমি পারলাম না। হেরে যাওয়াতেও আনন্দ আছে বৈ কি!

আমারই বাংলার বুকে এই ছোট্ট পাহাড় চন্দ্রনাথ, কিন্তু আমরা ক'জন তা দেখতে আসি? কেন আসি না? এই যে শ্যামল কোমল গভীর শীতল বনস্থলী, এই যে বিসর্পিল সোপানবদ্ধ সামান্য চড়াই উতরাই-এর আনন্দ, এ যেন নিতান্ত ঘরোয়া জিনিষ, যার মধ্যে বিরাট বিপুল অশেষ সমারোহ নেই, তুষারমৌলি হিমশিখরের প্রচণ্ড গাম্ভীর্য নেই। তবু তো যতদূর দৃষ্টি যায় ধরিত্রীর নতুন রূপ দেখা যায়। বিমান হতে পৃথিবী দেখার খানিকটা আভাস মেলে।

রেখা দাঁড়িয়ে আছে দূরে সাগরের দিকে মুখ করে। বাতাসে তার আঁচল উড়ে চলেছে, চুল উড়ে মুখে চোখে পড়েছে। তার প্রস্ফুট যৌবন ঘিরে জেগে উঠেছে মুক্তির আনন্দ।

দূরে সাগরের আভাস আর নিকটে ক্ষেত-খামার; রেল ইষ্টিশান, চলমান রেলগাড়ি, এমনকি আমাদের অত লম্বা ধর্মশালা আর তার বিশাল দীঘিটিও ছোট্ট খেলাঘরের মত দেখাচ্ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা পথটা উপবিতের মত শীর্ণ, শুভ্র ও সর্পিল।

আর এ দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, অনেক দূরে ঘন অরণ্যের আভাস। সব ছেয়ে আছে বাংলার সবুজ শ্যামল বর্ণ। পাহাড়ের পাথর ঢেকে গেছে বন। কোমল সবুজ বর্ণ। জনৈক বিদেশী স্থপতির সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের দেশে কি দেখলে? সে সাহেব বল্লে—রং। এমন উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গাছের ঘাসের পাহাড়ের বনের

এমন গভীর সবুজ বর্ণ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। বিদেশীর মনেও তবে বাংলার এই বর্ণাঢ্য রূপ সব চেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছে।

চন্দ্রনাথের মন্দিরেরও লোহার গরাদ তালা বন্ধ ছিল, কিন্তু দেবদর্শনে তাতে বাধা নেই। মন্দিরের সর্বত্র যাত্রীরা নাম স্বাক্ষর করে অমর হয়ে থাকবার চেষ্টা করে গেছে। বারান্দার চালে, মন্দিরের সুমুখের মণ্ডপের ছাদ পর্যন্ত অজস্র নাম লেখা। মুসলমান দর্শনার্থীর নামও অমিল হলনা দেখে তাদের সৌন্দর্যবোধের উপর শ্রদ্ধা হ'ল। কিন্তু দর্শকদের এই নাম স্বাক্ষরের মোহ পীড়াদায়ক বোধ হয়।

নেমে আসবার আর একটা পথ আছে। তর তর করে নামা যায়। ওঠার চেয়ে নামাই সহজ। কিন্তু সিঁড়ি কখনও কখনও বেশ ঢালু, আর ধাপগুলি অনেক নীচু নীচু। না জিরিয়ে চলা রেখার মায়ের পক্ষে তো অসাধ্য।

ধর্মশালায় ফিরে এসে পুকুরের চত্বলে বসে বিশ্রাম করা গেল। খানিক পরে বিকাশ বাবু গেলেন চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য পুস্তিকার সন্ধানে পাণ্ডাদের উদ্দেশে, রেখার মা গেলেন রন্ধনাদির তত্ত্বাবধানে এবং আর এক দফা খাবার ও শীতল পানীয় রেখা পুকুর পাড়েই নিয়ে এলো। সাথে তার ভাই বোন। চন্দ্রনাথ পথেই জুটিয়ে দিলেন সঙ্গী যারা ক্ষণিকের জন্য জেনেও জীবন মধুর করে তুলতে পারে।

ঃ-ঃ

নর্মদাতীরে তালকুঞ্জ

"গঙ্গেচ যমুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদা সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥"

আচমনের পূর্বে কোশাকুশির জল এই মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। গঙ্গা যমুনা গোদাবরী দেখেছি, এবার নর্মদার কূলে ব্রোচ এসে এই মন্ত্রটা আমার বার বার মনে পড়তে লাগল। নর্মদা,—ইংরাজী বানানে যাকে বিকৃত করে করা হয়েছে নারবুডা, এমন একটা চমৎকার নাম, যে নামের সাথে আমাদের পিতৃ-পিতামহ হতে উর্দ্ধতন শত পুরুষের মনে শ্রদ্ধাসম্ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের একপ্রান্তে ধূসর গুর্জর ভূমির কঠিন গাত্রের এই স্নেহ পীযুষ ধারা শত সহস্র বৎসর ধরে বয়ে চলেছে। কত মুনি-ঋষি এর পূত বারিধারায় অবগাহন করে উঠে সূর্যস্তোত্র পাঠ করেছেন সে কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। ব্রোচও খুব পুরোনো শহর, এর প্রাচীন নাম ছিল ভরোচ।

শীতের প্রারম্ভ, নদী শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে, ব্রোচের দিকে চর জেগেছে অনেক প্রশস্ত হয়ে। নর্মদা গর্ভের উর্বর জমিতে ফলে উঠেছে জোয়ারের ক্ষেত, সবুজের সমারোহ চোখ জুড়িয়ে দেয়। পিলু দিয়ে বসিয়েছে তামাক। টীয়ে উড়ে বসেছে টেলিগ্রাফের তারে। ওই দেখতে দেখতে ধূলিমলিন পথ ছেড়ে পুলে উঠলাম। ১৮৭৭ সালে সুরু হয়ে ১৮৮১ সালে এই পুল তৈরী শেষ হয়েছিল, কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল কিছুমাত্র ক্ষতি করেনি মনে হল। ভারী লরিও পার হয়ে যাচ্ছে। পাশে রেলের আলাদা পুল।

ওপারে যেয়ে দেখি চারিদিক ফাঁকা মাঠ। এপারের দিকে তাকালে,

ব্রোচ সহরের উচুনিচু সড়কের পাশে পাশে বাড়ীঘরগুলি খেলাঘরের মত মনে হয়। যেন কোন পাহাড়ী অঞ্চল।

আর ওদিকে আঙ্কেলশ্বরের পথে খানিকটা এগুলেই হাতছানি দিয়ে ডাকে কী চমৎকার এক তালকুঞ্জ। লোভে লোভে পা বাড়ালাম। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যত যাই পথ আর ফুরায় না। একঘণ্টার কাছাকাছি চলবার পর তালকুঞ্জে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু উঁচু সড়ক হতে তালকুঞ্জ তখনও অনেকদূরে। দূরে অল্প জলভরা খাল পেরিয়ে নিচু জমি। তারপর অঢেল জোয়ারের ক্ষেত, তারই মাঝে সবুজ সাগরে নীলদ্বীপ, তালকুঞ্জ কালো কালো হাজার পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝাকড়া চুল মাথায় নিয়ে।

দমিত না হয়ে উঁচু সড়ক হতে মাটি ধরে ধরে নামলাম, খুঁজতে লাগলাম জলের পাশে কিছুটা শুকনা জমি যদি মেলে। পেয়ে গেলাম ঠিক যেমন চাইছিলাম। লাফ দিয়ে পার হয়ে ওপার পৌঁছে পায়ে চলা পথ দেখে আশা হ'ল, হয়ত তাল-কুঞ্জের দিকে যাওয়ার পথ আছে।

কিছুদূর এসে পথ জোয়ারের জমিতে মিশে গেল। জমির পাশে পাশে চল্‌তে লাগলাম। ঘাসের শিশিরে জুতা গেল ভিজে, আহা তবু সেই কচি কোমল সবুজ জোয়ারের পাতার পাশ দিয়ে চলতে কি আনন্দ!

খানিকটা যেয়ে কাঁটা ঝোপ ও জলের সরু নালা দেখে দাঁড়ালাম থমকে। আসছিল একজোড়া বয়েল নিয়ে পাগড়ি মাথায় একজন চাষী। অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ, সে চলে গেলে তার পথের দিকটায় খানিকটা ঘাসের জমি মাড়িয়ে পৌঁছান গেল। আবার পায়ে চলা পথ পেলাম, সে পথ গেছে সোজা তালকুঞ্জে।

তালকুঞ্জের ছায়াময় পরিবেশ ইতিপূর্বে বাংলায় ও সাওতাল পরগণায় দেখেছি। আশা করছিলাম, তেমনি ঘাসে ঢাকা জমির উপর তালগাছ হেলান দিয়ে বিশ্রাম করে নেব। কিন্তু পথ চলে গেছে ঘন জোয়ার গাছের মধ্যদিয়ে। আঁক গাছের মত উঁচু হয়ে উঠেছে জোয়ারের গাছ, সারিবন্দী

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। যে কোন সারির মধ্য দিয়ে সহজে চলা যায়। গায়ে এসে লাগছে উজ্জ্বল সবুজ দীর্ঘ পাতলা পাতা, চলবার পথে নাড়া লেগে দুলে উঠছে দুধারের সারি। দূরের সারি হতে যেন দেখছে মাথা উঁচু করে,—কে যায়! জীবন্ত জগৎ, উজ্জ্বল জগৎ, বর্ণাঢ্য জগৎ।

তালকুঞ্জের মাঝখানটা ফাঁকা, বেগুনে মাটি চাষ করে গেছে এই মাত্র। বলদ দুটি পাশে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। একজন বৃদ্ধ চাষী, মাথায় কাপড়ের টুপি, গায়ে ময়লা পিরাণ, মাটি হতে কি খুঁটে খুঁটে কোচড়ে রাখছিল।

কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: কি খুঁটে তুলছো?

চীনে বাদাম দেখাল সে, দিলে সে হাতে তুলে। মাছরাঙ্গা এসেছে পোকা মাকড়ের সন্ধানে। শালিক ফিরছে পিছে পিছে। কাক আর কাঠবিড়ালী ফাঁক পেলেই চিনে বাদাম কুড়িয়ে নিয়ে পালাচ্ছে। মজুরেরা এসে তখনও পৌঁছেনি। বৃদ্ধ একা বসে পাহারা দিচ্ছে।

অনেকগুলি তালগাছ, স্থানে স্থানে ছায়া হয়ে আছে। সবটা ঘিরে উঠেছে গভীর সবুজ জোয়ারের ক্ষেত। খানিকটা জমিতে চীনা বাদামের খন্দ উঠল, এবার বসবে তাম্বাকু। পাশের জমিতে তিল গাছ বেশ বেড়ে উঠেছে, ফুল ফুটেছে, ফল ধরেছে, ভোমরা উড়ছে। একখণ্ড জমি পড়ে আছে, খড় হয়েছে,—গরু মহিষে খাবে।

চাষীটির নাম হরিভাই প্যাটেল, (উচ্চারণ করলে 'হড়িভাই')। তাল গাছ লাগিয়ে বছরের চার পাঁচ মাসে রস বেচে হাজার দুই টাকা পেত। সম্প্রতি তিন চার বছর সরকার বন্ধ করে দিয়েছে তালের রস তৈরী করা।

বলা বাহুল্য তাড়ি মাদক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার ভিন্ন তালের রসে গুড় হতে পারে, কিন্তু গুড় করবার অনুমতি পেলেই তাড়ির কাজটাও চলতেই থাকে! বাড়তি আয় বন্ধ হয়েছে, বৃদ্ধ তাতে যে বিশেষ দুঃখিত তা মনে হলনা। বল্লে পরিষ্কার—সরকার তো ভালোর জন্যেই বন্ধ করেছে। লোকে নেশা করেই তো সর্বনাশ করে। অবশ্য তাড়ির ব্যবসায়ে মোটা মুনাফা

পার্শিদের। তারা এই নিয়ে লড়ছে খুব। আমি জমি জেরাত নিয়ে পড়ে আছি। খন্দ তুললে অত পয়সা না পাই পেট তো ভরে।

স্পষ্ট সোজা কথা। আত্মবিশ্বাসী এই সরল তালকুঞ্জের মালিককে নানা কারণে আমার মনে থাকবে। আমার দেশ বাংলায় শুনে সেখানকার হাল, খামার খন্দের খবর শুনতে চাইলে। জোয়ার হয়না শুনে বিস্মিত হ'ল; ধান অবশ্য এরাও করে, কিন্তু বাংলার মত এমন একসর্বস্ব ভাবে নয়।

স্বাস্থ্যবান বড় বড় বলদ, তেমনি রুক্ষ কঠোর ইটের কুচির মতো কঠিন বাদামী মাটি। সবল হাতে লাঙ্গল চষে এই কঠিন মাটির বুকে সবুজের বন্যা বহিয়ে ছেড়েচে এমন শ্রমশীল এই গুর্জরের মানুষ। ভালো লাগল হরিভাই প্যাটেলকে।

আসবার সময় কোচড় হ'তে দুহাত ভরে চীনা বাদাম দিলে আমায়। তার আন্তরিকতাকে অস্বীকার করতে পারলাম না। দুল্‌তে লাগল জোয়ারের গাছ, তালকুঞ্জের ছায়ায় মাটির পাইপ মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুগ্ধ বিস্মিত চাষী, আমি নর্মদা কূলে আমার কুটিরের দিকে পা বাড়ালাম।

ঃ-ঃ

দিনলিপি

অমরাবতী, ৬, ১২, ৪৬

ওঃ, ঘুমিয়ে যে কী আরাম বোধ হয় এর আগে অমন করে কোন দিন অনুভব করিনি। রাজকোট হতে বেট দ্বীপ, ফের বেট দ্বীপ হতে ওখা দ্বারকা, জামনগর রাজকোট হতে ঝিমুতে ঝিমুতে যেদিন আমেদাবাদে পৌছলাম তখনই অবস্থা কাহিল। আমেদাবাদে বড়দা ছিলেন, যেয়ে শুনি দাঙ্গার গণ্ডগোলে তিনি ছুটি নিয়ে বৌদিদের দেশে রাখতে গেছেন। দেশে মানে বাংলাদেশে। From frying pan to fire কথাটা বড়দার জানা ছিল কি?

যাকৃগে, কিন্তু আমার একটা হিল্লে হওয়া দরকার। ছোড়দা থাকেন অমরা-বতী, প্রায় দুই দিনের রাস্তা, সেখানে যাব কি যাব না ইতস্তত করছি, এমন সময় সহরে আবার আগুন লাগল। মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম, সহসা বিষম শব্দ, লোকজনের ছুটাছুটি। প্রথমে আমিও আশ্রয়ের জন্য ছুটে-ছিলাম, কিন্তু অচিরেই কৌতূহল দমন করতে না পেরে অকুস্থলে গেলাম।

একটা টংগা হতে দুজন লোক নামছিল, তাদের কাছে ছিল হাতবোমা, পড়ে যেয়ে ফেটে একটির ভবলীলা সেখানেই সাঙ্গ হয়ে গেছে, আর একজনের অবস্থাও সঙ্কটজনক। দুটি দেহই নিয়ে গেল পুলিসে। পড়ে রইল রাস্তায় অনেকখানি রক্ত আর তার মধ্যে জড়াজড়ি করে দুটি টুপি দুরকমের। এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। রক্তের মধ্যে ওই টুপি দুটি গোটা ভারতবর্ষের চেহারার প্রতীকের মত দেখাতে লাগল। কল-কাতা-নোয়াখালি-বিহারের ঘটনা চোখে দেখিনি, এতখানি নররক্ত জীবনে কোনদিন দেখিনি, এই ঘটনা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম।

হাওয়ার বেগে ছুটে গেল দুঃসংবাদ, নানাভাবে পল্লবিত হয়ে। তারই প্রতিধ্বনি ঘটল দু'চারটা উত্তরে দক্ষিণে। সন্ধ্যা আটটা হতে সান্ধ্যআইন চলছিল সহরে, সেটা বর্ধিত হয়ে মহরম উৎসবের সময়টায় ছত্রিশ ঘণ্টা কার-ফিউ অর্ডার জারি হয়ে গেল। সুতরাং আমেদাবাদে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠল। গেলাম সবরমতি আশ্রমে, হৃদয়কুঞ্জ দর্শন করে আসবার আকাঙ্খা ছিল প্রবল। হৃদয়কুঞ্জ সেই কুটীর, মহাত্মা গান্ধী যেখানে দশ দশটা বছর বাস করেছিলেন। ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল একদা এই বালুকাবিস্তৃত বেলাভূমিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রার্থনা সভায়, এই নদীমুখী কুটীরে। ধূলা তুলে দিলাম মাথায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ডাণ্ডিযাত্রার একখানি রঙ্গিন চিত্র, হৃদয়কুঞ্জের দেওয়ালে লাগানো।

পূর্ণ হৃদয়ে আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলাম। ছোড়দার কাছেই যাই। কাছের টাকা পয়সা ফুরিয়ে এসেছে, তাছাড়া এই দুর্যোগময় দিনে যত্র তত্র

ঘুরে বেড়ানোর দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। অমরাবতীর উদ্দেশে গাড়ীতে চাপলাম আমেদাবাদে। আমেদাবাদ হতে সুরাট, সুরাট হতে ভুষাওয়াল, ভুষাওয়াল হতে বান্দেরা, তারপর আর একটীমাত্র ষ্টেশন, গাড়ী বদলে ভোর বেলায় এলাম অমরাবতী।

বলা যত সহজ হল, ব্যাপারটা তত সহজে হয়নি। সমস্তটা পথ বিষম ভিড়। এমন সৌভাগ্য করে আসিনি যে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাশের গদীআঁটা ফ্যান-খোলা কামরায় আরাম করে শুয়ে বসে আসব। আসতে হল মহাত্মা-জীর ক্লাশে, জীবন্ত ভারতের রূপ দেখতে দেখতে। স্বামীজীর ভাষায় 'আমার মূর্খ ভারত, দরিদ্র ভারত' হতে স্থরু করে আবার বর্তমানের ব্লাকমার্কেটের ভারত এবং স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ ভারত দেখতে দেখতে।

একটার পর একটা রাত চলে গেল,—ঘুম নেই। একটার পর একটা দিন চলে গেল , খাবার নেই। ঘুম ও খাওয়ার অভাবের চেয়ে তীব্র হয়ে বাজতে লাগল,—আজ কতদিন যে স্নান নেই! সেই যে সপ্তাহের গোড়াতে বেট দ্বীপ পার হয়ে ওখা বন্দরে আরব সমুদ্রের জল স্বাদ নিতে নেমেছিলাম, সেই নোনা জলের গুড়া আমার প্রতি লোমকূপে লেগে আছে, লেগে আছে চুলের জটায়। ধূলিতে, ধোঁয়ায়, কয়লার গুড়া, সিগারেটের ছাই আর এতদ্দেশের শাখাআরোহী স্বভাবের যাত্রীদের সহজগতি বাঙ্ক আরোহণ সমারোহে কত মহাজনের পদধূলিও সে জটাজালে সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র সান্ত্বনা সবরমতী আশ্রমের ছোঁয়াটুকু। কিন্তু সে তো ধূলি নয়, বালি, ঝরে পড়ে গেছে কী এই অত্যাচারে?

খুঁজতে খুঁজতে গেলাম ছোড়দার ঘরে। বৌদি তো দেখে চিনতেই পারেন না। ওমা, এ কী চেহারা করেছ! চা দিয়ে বসে কুশলপ্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি বললাম, চা না দিয়ে যদি এক বালতি গরম জল দাও আর এক টুকরো সাবান, তাতে স্নান করে বাঁচি। আমার বিষম ঘুম পাচ্ছে, বসতে পারছি না।

বৌদি বললেন, তা আমি চেহারা দেখেই বুঝেচি। চা টুকু খাও, আমি স্নানের জল চাপিয়েছি।

আমার চা খাবার পর বৌদির চাকর 'হাজাম' ডেকে নিয়ে এলো। এ দেশী পরামাণিক। বৌদি বল্লেন শুধু দাড়ি কামানো নয়, বাবুর চুলটাও ভাল করে ছেটে দে দেখি।

বাংলার বধূ, এসেছেই না হয় খান্দেশ মধ্যপ্রদেশের ধূলিজীর্ণ স্হরে। তবু সেই স্নেহটাই উপছে উঠছে যা নারিকেল ছায়াবীথি দিয়ে জলকুম্ভ কক্ষে নিয়ে আসা পল্লীনারীর পক্ষেই শোভন হয়।

চুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে, সাবান মেখে স্নান করে, ভাত খেয়ে যখন বিছানার কাছে এলাম তখন মনে হল স্বর্গলাভের আনন্দ বোধ হয় এর চেয়ে বেশী নয়।

ঘুমালাম, পড়ে পড়ে ঘুমালাম। দু' ঘণ্টা চার ঘণ্টা যতক্ষণ খুশী। শেষের দিকে জেগে জেগে, স্বপ্ন দেখেও ঘুমালাম। যখন উঠলাম তখন বেলা পড়ে গেছে।

কাছেই চেয়ারের হাতলে রেখেছিলাম ধূলি বিমলিন হাফ সার্টটা, তার পকেটে আমার প্রাণপ্রিয় সিগারেট। 'এ সিপ, এণ্ড এ পাফ্' জীবনের অর্থ জানিয়ে দেয়। সিপটা অভ্যাস করিনি, সামর্থ্যেও কুলায় না। কিন্তু পাফ্! সিগারেটের সূক্ষ্ম ধোয়া যখন মোলায়েম রেশমি রুমালের মতো ধীরে ধীরে বায়ুস্তর ভেদ করে কুণ্ডলীত হতে থাকে তখন আমার মেজাজে আর মগজেও যেন পর্দার পর পর্দা খুলে যায়। সাহিত্য-চর্চা যদি করতাম, আমার নাকি ভবিষ্যৎ ভালো ছিল, বলেছেন আমার একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক বন্ধু। কিন্তু তিনি সিগারেট খান না। তিনি জানেন না, সিগারেট সাহিত্যের চেয়েও মধুর, তার চেয়েও বায়বীয়, তার চেয়েও পরিস্ফয়মান। সিগারেটের সব চেয়ে শুভ ইঙ্গিত যে সে নিজে পুড়ে যায়, পিছে তার রেখে যায় না কিছু। আনন্দ দেওয়ার সাথে সাথে সে অনন্তে মিশে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎকে ভারাক্রান্ত

করতে কালো কালো অক্ষরের গ্রন্থি রচনা না করে। সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সেই বিলয়ের মধ্যেই তার নিলয় রচনা করে। যেন ক্ষণবসন্ত, তাই তো তাকে না হলেই নয়।

সিগারেট এখন একটা চাই-ই, এই এক নাগাড়ে এতো ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে। কিন্তু জামাটা? চুরি গেলো নাকি? শেষ পর্যন্ত নয় পয়সার সম্বল ঝুল পকেটে গড়াচ্ছিল, একটা দুয়ানি আর একটা ফুটা পয়সা। দশটা পয়সা পুরা হলেও এক বাক্স সস্তা সিগারেট কিনে ফেলতে পারতাম, তা হল না দেখে স্টেশনের এক ভিখারিণীকে দুআনিটি ভিক্ষা দিয়েছি। বাকী ছিল পয়সাটা আর গোটা চারেক ডিলাক্স টেনর সিগারেট, আর সব চেয়ে মূল্যবান,—বর্ত-মানের বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অমিল একটা দেশলাইয়ের আধাআধি। আর, —আর কিছু ছিল নাকি?

ছিল। বুক পকেটে গুরু মহারাজের ঠিকানাটা, আর ধনী বণিক ওঁকার নাথের একখানা কার্ড। শেষোক্ত জিনিষ দুটি পয়সা দিলেও পাব না, কিন্তু ও দুটির প্রয়োজন আছে কি?

গুরু মহারাজের নামটা পুরা বলব না। সুকুলজী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের এমন জাজ্বল্য চেহারা গোটা ভারতবর্ষে দেখিনি। তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী বলা শক্ত, কিন্তু সন্ন্যাসীর মধ্যেও এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ক'জন আছেন কে জানে। জামনগরের খানিকটা এদিকে তিনি ট্রেনে উঠেছিলেন, কোথায় উঠেছিলেন লক্ষ্য করিনি। আমি চলেছি বেট দ্বীপ। ভারত ছাড়িয়ে আরব সাগর, না ওটাকে কচ্ছউপসাগর মধ্যেই বলা সঙ্গত, এক মুঠি মাটি,—বেট দ্বীপ। ওখা বন্দরের সুমুখে মাইল তিনেক জল পার হলেই পাওয়া যাবে। দ্বারকানাথ রণছোড়জীর মন্দির আছে সেটা দেখা হবে, সঙ্গে সঙ্গে হবে সমুদ্রদর্শন, সমুদ্রস্নান, বিদেশাগত জাহাজের লোকদের সঙ্গে আলাপ। সেই সব কথা ভাবছিলাম আর ময়ূর উড়ে যাওয়া বাজরা ক্ষেত, লম্বা গলা বাড়িয়ে চলা সারসদম্পতির গভীর সবুজ তামাক ক্ষেত এই সব দেখতে

দেখতে চলেছিলাম। অকস্মাৎ যেন আমার সুমুখে সূর্যোদয় হল, সুকুলজি মহারাজ এসে দাঁড়ালেন। তিনি আমার পূর্বপরিচিত। পথেই আলাপ।

উঠে দাঁড়ালাম। ভিতর হতেই যেন কে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। তিনি শুধু হেসে বল্লেন, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে বেটা।

ওটা বলা তার পক্ষে যত সহজ, আমার পক্ষে তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তির সুমুখে বসা তত সহজ নয়। কিন্তু ভাবটা কেবল আমার মধ্যে নয়, আমার আশেপাশে সবার মধ্যেই এই সৌম্যমূর্তি শুভ্রশ্মশ্রু সদাহাস্য মানুষটির উপস্থিতি একটা স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিলে। মানুষের দেহটা যে এমন চমৎকার স্থিতিস্থাপক তা এর আগে কে জানত? সরে সরে বসে অনেকখানি যায়গা ফাঁকা হয়ে গেল।

সুকুলজি বসলেন। তখন তার আড়াল হতে বেরিয়ে পড়ল আটপৌরে সাদা শাড়ি পরা একটি সুশ্রী কুমারী মূর্তি। হাতে শিব মূতি আঁকা ছোট একটি কাপড়ের থলে, তাতে সামান্য জিনিষ পত্র। মেয়েটি বৃদ্ধের দক্ষিণে বসলে, তারপর আমি আমার স্থান গ্রহণ করলাম।

আলাপ হল, এমন অকুণ্ঠ ভাবে কোন মেয়েকে আমি আলাপ করতে দেখিনি। আমার কুণ্ঠা আমাকে পীড়া দিতে লাগল, কিন্তু তার ব্যবহারে মনে হল আমাকে যেন সে কতকাল চেনে।

নাম মৈত্রেয়ী, সুকুলজি কখনো মৈত্রেয়ী মায়ী বলছিলেন, কখনো মৈত্রী, মৈ বলছেন কখনো বা। আর মৈত্রেয়ী তাকে সুরু হতেই 'বাবা' বলছে। কিন্তু তিনি যে তার জনক নন, সে কথাটাও অকুণ্ঠে আমাকে বলে ফেল্লে। এটা আমি আশা করিনি পাতানো সম্পর্কটাও লোকে যাকে তাকে ভেঙ্গে বলে না। কিন্তু মৈত্রেয়ী বল্লে। সবটা খুলে বল্লেন বৃদ্ধ নিজে। মৈত্রেয়ী তার ভ্রাতুষ্পুত্রী। ভ্রাতার সংসার পূর্ণ দেখেই তিনি প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। ক'বছর পরে যখন ফিরে এলেন, তখন যুদ্ধ বেধেছে ইংরাজ জার্মানে। এ দেশেও তার ঢেউ লেগেছে। তার ভ্রাতার সংসারটিরও

পরিবর্তন হয়েছে। ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর মা মারা গেছেন। তার বাবা যুদ্ধের দৌলতে আগের চেয়ে অনেকগুণ বেশী রোজগার করছেন। সংসারের শ্রী ফিরে গেছে। এসেছে নতুন একটি সুশ্রী তরুণী স্ত্রী, সে মৈত্রেয়ীকে তত অপছন্দ করত না, কিন্তু আশ্চর্য, তার পিতা, সুকুলজীর ভাই, চাইছিলেন মৈত্রেয়ী তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর শান্তি নষ্ট না করে। পিতার নির্যাতনের হাত হতে উদ্ধার করলেন পিতৃব্য, মৈত্রেয়ীকে সে সংসার হতে নিয়ে এলেন।

সুকুলজি বলতে বলতে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। একদিন ভাইয়ের ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে মৈত্রেয়ীকে নিয়ে এলাম। তখন ও ছোট্ট মেয়ে, বছর দশেক বয়স। নিজে কোন দিন সংসার করিনি, ওকে নিয়ে জামনগরে এসে বাসা করলাম। আগে এখানে শিক্ষকতা করতাম, সংসার ত্যাগ করে পুনর্বার চাকুরী গ্রহণে ইচ্ছা হ'ল না। মন্দিরে শাস্ত্র পাঠ করি, বাপ-বেটীর চলে যায় কোন রকমে। এখন ওর বয়স ষোল বছর হ'ল। একটা হিল্লে করে দিতে পারলে আমি আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। বেটী আমার পায়ে শিকল দিয়ে রেখেচে।

সাধক জীবনের, গভীর পাণ্ডিত্যের অবর্ণনীয় অমল সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে বৃদ্ধের মুখে, তার শুভ্র শ্মশ্রুতে, প্রশস্ত ললাটে, মুক্তাধবল দন্তপংক্তিতে। সাদা জামাকাপড়, তার মধ্য হতে তার বিরাট বপু ও গম্ভীর ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুট পরিচয় আমাকে অভিভূত করে ফেলছিল। মৈত্রেয়ীর সঙ্গেই কথা বলছিলাম। কত দেশের কত বড় বড় পণ্ডিত তাদের বাসায় আসা যাওয়া করেন শুনলাম, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বলেই যে সে এমন অকুণ্ঠ হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম সে শিক্ষা পেয়েছে এই পরিবেশের মধ্যে এক উচ্চ আদর্শের যাতে অহেতুক লজ্জা, অন্যায় কুণ্ঠার ছায়া পড়েনি তার মনে। মৈত্রেয়ীর বাম নাসিকায় জ্বলছে ছোট্ট একখানি হীরার নাকচাবি, বোধ হয় দশ বছর বয়সে চলে আসবার সময় যে

হীরাটা পরা ছিল এখনো সেটাই পরা আছে, বয়সের পরিমাণে সেটা একটু ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু ওই হীরার মত নির্মল তার বালিকামনও এতটুকু সংকোচ সন্দেহের লজ্জা-কুণ্ঠার বর্ণে প্রতিভাত হয় নি এটা যেন আমাকে বিস্মিত করে দিলে।

পিতৃপরিচয় সে গৌরবের সঙ্গে দিলে, বল্লে, সুকুল মহারাজ বল্লে জামনগরে ছেলে বুড়ো সবাই চেনে বাবাকে।······মন্দিরের কাছেই আমরা থাকি, বাবা ওখানেই শাস্ত্র পাঠ করেন কি না।

নামবার সময় তার সাদা কাপড়ের থলেটা ইচ্ছা করেই ফেলে গেল কি না জানি না। ফিরে এসে ট্রেনের জানালা দিয়ে ব্যাগটা চাইলে। হাত বাড়িয়ে দিলাম ব্যাগটা, চাপার কলির মত নরম সুশ্রী প্রসাধনহীন অঙ্গুলিগুলি লাগল আমার ধূলিমলিন সিগারেট-জ্বলা নিকোটিন-রঙ্গানো আঙ্গুলে। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে বল্লে, ঠিকানাটা লিখে রেখেছেন তো? আসবেন কিন্তু অবশ্য অবশ্য ফিরবার পথে যখন জামনগরে আসবেন। ওই সময় কাশীর পণ্ডিত বলভদ্র শর্মার আসবার কথা আছে, এলে পরিচয় হবে। আচ্ছা, নমস্তে।

চলে গেল তারা। ঠিকানাটা লিখে বুক পকেটে রেখেছিলাম সেটা খুলে পড়লাম। নাম······সুকুল।······মন্দির, জামনগর। খুঁজে বের করা কঠিন নয়, কঠিন নয় সুকুল মহারাজের পায়ের শিখল খুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করা। ক্ষণিকের জন্য মনে হল তার চেয়ে পুণ্য কর্ম বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু আমি কেন, সেজন্য তো বলভদ্র শর্মারা রয়েছেন, রয়েছেন আরো কত শিষ্য প্রশিষ্যের দল যারা সুকুল মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করে জীবন ধন্য করতে পারেন। বিশেষ করে আমি বিদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী। কিন্তু তবু ওই অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ, ওই যে উদার আহ্বান, সহজ নমস্কার, এর কিছু কি অর্থ নেই? একি সব বৃথা?

দ্বারকা হতে ফিরবার পথে নেমেছিলাম জামনগরে। নামতেই মাথায়

ঢুকল প্রসিদ্ধ সোলারিয়াম, সূর্যরশ্মি দিয়ে সেখানে নানা রোগের চিকিৎসা হয়। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই ব্যবস্থা আছে, ভারতবর্ষে শুনেছি এই একমাত্র সোলারিয়াম। গেলাম সেখানে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব বিভাগের কাজ, যন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবহার বুঝিয়ে বল্লেন একজন সদয় ভদ্র চিকিৎসক। বিজ্ঞান প্রণতি জানাচ্ছে সূর্যকে যার জ্যোতির দিকে সশ্রদ্ধ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেদের ঋষি গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মনটা হাজার হাজার বছর পিছনে চলে গেল, দেখতে লাগল বল্কল পরিহিত দীর্ঘ জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী সমুদ্রস্নান করে উঠে পূর্বাস্য হয়ে করজোড়ে স্তোত্রপাঠ করছেন। তার সুমুখে নীল সিন্ধু মন্থন করে উঠছেন জবাকুসুমসংকাশ মূর্তি। প্রকাশিত হচ্ছে জগৎ জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে।

বিমনা হয়ে কী ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। জামনগরের পথে পথে অগণিত মন্দির, মসজিদ আছে পাশাপাশি। কোন বিরোধ নেই। জৈন মন্দির, হিন্দু মন্দির, গিরিধারী মন্দির হতে হতে এলাম সেই মন্দিরে। ঠিকানাটা পকেটে ছিল, ভুল করিনি বিন্দুমাত্র। প্রশস্ত মন্দির তল, শুভ্র শীতল মর্মর প্রস্তরে আবৃত। প্রণাম করে কিছুক্ষণ বসলাম, দেহমন শীতল হয়ে গেল। একপাশে কাঠের বেদী করা। একটি তাকিয়া আছে। সুমুখে ছোট্ট কাষ্ঠাসনে রেখে শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করা হয়। এইখানেই তবে সুকুল মহারাজ শাস্ত্র পাঠ করেন। মহারাজের বাসভবনও নিকটেই হবে।

উঠে গেলাম সেই দিকে। পাথরের ছোট বাড়ী, পাথরের গাঁথুনিটা বাইরে থেকেই চোখ পড়ে। বাড়ীর সুমুখে ফুলবাগান, একটা ছায়াকর বড় গাছ, ছোট পথ গিয়েছে বারান্দার দিকে। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। কেউ কোথাও নেই। পথ দিয়ে উঠের পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিয়ে গেল দেহাতী মানুষ, ময়লা কাপড়ের পাগড়ী মাথায়, কাথিয়াবাড়ী পোষাক পরণে। আমি চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছি। কা'কে জিজ্ঞাসা করি, এই মহারাজের বাসভবন কিনা তাই ভাবছি আর ইতস্তত করছি। এমন সময় গৃহমধ্যে সুললিত কণ্ঠে সংস্কৃত

শ্লোক উচ্চারিত হয়ে উঠল। শকুন্তলার শ্লোক। একটার পর কএটা শ্লোক পড়ে যাচ্ছে কোমল মধুর নারীকণ্ঠে। সেই বর্ণনা, কণ্ব মুনির আশ্রম হতে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করছেন, আশ্রমের তরুলতা হতে পশুপক্ষীটি পর্যন্ত অভিভূত হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, পরিষ্কার বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত পাঠ। তারপর পায়ে পায়ে চলে এলাম। ট্রেনের দেরী নেই। রাজকোটের গাড়ি ধরতে হবে। দেখা করতে দ্বিধা হল, মৈত্রেয়ীর এ স্বর্গবাসে আমার হানা দেওয়ার অধিকার নেই, তাকে উদ্ধার করবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

অলসভাবে বালিসটা কোলের উপর তুলে নিয়ে দেখি সিগারেট দেশলাই সহ ওঁকারনাথের কার্ড আর স্বকুল মহারাজের ঠিকানাটা বৌদি আমার বালিশের নিচে রেখে জামাটা কাচতে নিয়ে গেছেন।

পথের রোমান্স

বরিশাল হতে চাঁদপুর যাব, ষ্টীমার রাত দু'টোয়। বরিশালের হোটেলে বসে বসে গুজব শুনছি, ঢাকার জাহাজ নাকি মারা পড়েছে। যাত্রীরা তাই শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। আমি এই পথে এবার নতুন এসেছি, আমার সঙ্গে যিনি আছেন, তিনি অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী কিন্তু চমৎকার বাংলা বলেন। কাপড়ের ব্যবসায় গুটিয়ে সুপারিতে নামা যায় কিনা তারই সন্ধানে বরিশাল এসেছেন। ফিরে যাবেন খুলনায় বাগেরহাটে। সুতরাং পথ আমাদের ভিন্ন কিন্তু মানসিক উদ্বেগ একই রকম।

শেষ পর্যন্ত আমার ষ্টিমার খুলনা হ'তে এসে ঘাটে ভিড়ায়। কেবিনে উঠে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করছি, এমন সময় এলেন মাঝারি বয়স্ক অচেনা এক ভদ্রলোক, ছোট বড় মিশিয়ে গুটি তিরিশেক মোট ঘাট নিয়ে।

এসেই তিনি আমার পাশের বার্থে বিছানা বিছালেন, কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন, জামা কোট হুকে ঝোলালেন, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা হয়ে পড়লেন।

আমার ঘুম আসছিল না তাই আমিও শুয়ে হাই তুলছিলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কথায় কথায় আমার ভবঘুরে জীবনের কথা জেনে তিনি মত প্রকাশ করলেন—রোমান্টিক লাইফ। অল্প বয়সে আমিও কিছুদিন এমনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

মাসখানেক হ'ল ঘর ছেড়েছি, ইতোমধ্যেই ট্রেনে ষ্টীমারে ঘুরে ঘুরে নানা ঘাটের জল খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, বিশেষ করে কিছুদিন হতে উদর পীড়ার উপদ্রব বুঝতে পেরে এই ভ্রাম্যমান জীবনের রোমান্স একেবারেই হারাতে বসেছিলাম, তাই ভদ্রলোকের কথাব আমি প্রতিবাদ করেই বল্লাম ঘুরছি তো অনেক দিন, কিন্তু রোমান্স তো কই পেলাম না কিছু।

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন, হবে হবে, সবুর করুন, নিশ্চয় হবে। ওঃ, আমার জীবনের সে ঘটনা আমি এখনও ভুলতে পারিনি, কোন দিন কি ভুলতে পারব?

ঘুম আসছিল না, তাই গল্পের গন্ধ পেয়ে উঠে বসলাম। বল্লাম, আপত্তি না থাকে তো ব্যাপারটা খুলেই বলুন না কেন।

ভদ্রলোক আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বল্লেন,—নিশ্চয় নিশ্চয়, ইয়োং ম্যান আপনারা, আপনাদের কাছে নিশ্চয় বলা উচিত।

ফিরছিলাম বরিশাল এক্স্‌প্রেসে রাণাঘাট বনগ্রাম থেকে। তখন মশায় আপার ক্লাসে এখনকার দিনের মত এত ভিড় থাকত না। আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট,—উঠেছি বনগাঁ হতে অন্য ট্রেন বদলি করে। রাতের

গাড়ি, বার্থ রিজার্ভ করেছি, ট্রেন এলে দেখলাম খালি গাড়ি। উঠে বিছানা বিছিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে একটি সিগারেট টেনে শুয়ে পড়ব মনস্থ করছি। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছাড়ল। এবার আমি বাথ রুমে যাব।

বাথরুম খুলতে যেয়ে দেখি দরজা ভিতর থেকে বন্দ, কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে না। ফিরে এসে উপর নিচে ঘুরে দেখলাম, কোথাও কোন যাত্রীর কিছু জিনিষ পড়ে নেই। বাথ রুমে তবে কে ঢুকে বসে আছে? চোর ডাকাত নয়তো? আপার ক্লাসে যারা যায় তারা নিশ্চয় সঙ্গতিসম্পন্ন এবং প্রায়শ' তাদের একাই যেতে হয়, সুতরাং দুষ্ট লোকের উপদ্রব করবার এই তো চরম সুযোগ। ট্রেন চলছে, ষ্টেশন ছাড়িয়ে খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। এখানে যদি আমাকে কুচি কুচি করে কেটে ফেলে যায় তবু দেখবার কেউ নেই। একমাত্র ভরসা দোদুল্যমান সরু শিকলটুকু যা টানলে চলন্ত ট্রেন থামিয়ে এখুনি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় এবং গার্ডকে ডেকে বাথরুম খুলবার ব্যবস্থা করা যায়। তাই করব ভেবেই উঠে দাঁড়িয়েছি, গেছিও শিকলটির দিকে এগিয়ে, এমন সময় খুট করে আওয়াজ হ'ল। গাড়ীর ভিতরে দুখানা পাখা চলছে, চলমান ট্রেনের চাকায় চাকায় হাজার বাজনা বেজে উঠেছে, সুতরাং তার মধ্যে অত ছোট শব্দ শুনবার কথা নয়। বস্তুত সেটা আমার মনেরই ভুল, তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে। বাথ রুমের দরজা তেমনি বন্ধ আছে। শিকলে হাত দিয়েছি, আবার যেন দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। এবার তাকিয়ে দেখি সত্যি দরজা খুলে গেছে এবং বেরিয়ে এসেছেন একজন তরুণী। একটা পা বাইরে বের করে তিনি বলে উঠলেন, ভয় পাবেন- না, শিকল টানবার দরকার নেই, আপনি বসুন।

ছেড়ে দিলাম শিকল, কিন্তু আমি বসতে পারলাম না। বাঙালি মেয়ের যে এত রূপ হয় এ কথা নাটকে নভেলে পড়লেও বিশ্বাস করতে পারিনি।

মানুষ যে রূপের ঔজ্জ্বল্যে কি বিভাময় হয়ে ওঠে তা সেদিন বুঝি প্রথম দেখলাম, আমি যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং একজন তরুণীর দিকে এমন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা যে সুরুচিসঙ্গত নয় এই স্বাভাবিক বোধটুকু পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেল্লাম। কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্য। তরুণী আসন গ্রহণ করেছেন এবং আমাকেও আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছিল, জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কোন ষ্টেশনে উঠেছেন, কোথায় যাবেন, আপনার জিনিষপত্র কোথায়?

এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করাও যে সমীচীন হল কিনা সে কথা পর্যন্ত আমার মনে এলো না।

তরুণী বল্লেন—আপনি কতদূর যাবেন?

খুলনা পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর ষ্টীমারে বরিশাল যাব একথাটি আমি অকপটে জানালাম।

তরুণী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বল্লেন, বাঁচা গেল,—তবু কথা বলবার একজন সঙ্গী পেলাম।

বলাবাহুল্য এমন সঙ্গ পেয়ে আমারও না বাঁচবার মত ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু এমন একজন অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী সম্পূর্ণ একাকী রাতের ট্রেনে জিনিষ পত্র না নিয়ে এমন ভাবে লুকিয়ে চলেছেন কেন সে কথা জানবার জন্য আমার কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠতে লাগল। আমিই তাঁর সঙ্গে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম।

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, তরুণী শুধু আধুনিকা ন'ন, সত্য সত্যই নিঃশঙ্ক এবং জড়তাশূন্য। আমি যে একজন অপরিচিত পুরুষ এবং ট্রেনে যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই এই সহজ সান্নিধ্যের কিছুমাত্র কদর্থ তাঁর মনে ছায়া ফেলেনি দেখে আমি খুশি না হয়ে পারিনি। বস্তুত এমন নিরিবিলি চলমান ট্রেনে এত অপরূপ রূপসীর সান্নিধ্যে আমার যে যৌবনোচিত কাব্যরস জাগেনি এটাই আশ্চর্য। তবু তাঁর কোন উপকার করতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বল্লেন,—খুব পারেন, আপনি আমাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন. এই ভাবে শেষ গন্তব্য পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই পরম কৃতজ্ঞ হব।

আমি বল্লাম,—কিন্তু কতদূব যাবেন সে কথা তো আপনি বলেন নি।

যেশোর—ইংরাজিতে বল্লেন তিনি। তারপর বল্লেন—কিন্তু তার আগেও প্রত্যেক ষ্টেশনে আমাকে আততায়ীরা আক্রমণ করতে পারে, তখন রক্ষা করবেন আপনি। রাজি আছেন তো?

রহস্যটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সত্যই যদি আততায়ীরা এঁকে আক্রমণ করে তবে রক্ষা করবার জন্য জীবনপণ করা যে কঠিন হবে না এটা যেন বুঝতে পারলাম।

পরের ষ্টেশনের কাছাকছি গাড়ির গতি মন্দীভূত হয়ে এলো। তরুণী অকস্মাৎ এক ছেলেমি কাণ্ড করে বসলেন। তিনি আঁচল ঘুরিয়ে মাথায় তুলে দিব্যি গুটি সুটি মেরে বসলেন, তারপর যেন রহস্য করেই বল্লেন, আর একটা উপকার করতে পারবেন?

কি? —আমি উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

বল্লেনঃ ধরুন যদি কেউ জিজ্ঞাসা আমি:কে, আপনি বলে দিতে পারবেন---আপনার স্ত্রী।

বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এ যে রীতিমত নাটক হয়ে উঠছে! এতক্ষণে তরুণীর কিছুমাত্র পরিচয় পাইনি, যে পরিচয় তাঁর সর্বাঙ্গে ফুটে আছে তার বেশি পরিচয় চাইবার অধিকারও আমার আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু একি প্রস্তাব! সত্যি কোন বিপদ বাধিয়ে বসে আছেন নাকি?

আমি চুপ করে আছি দেখে বল্লেন.ঃ—আপনার ভয় নেই কিছু। কোন বেআইনি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হবে না, একজন অবলার উপকার করা হবে মাত্র।

একি রহস্য না বিদ্রূপ ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। বস্তুত তিনি যে

আদৌ অবলা ন'ন সে কথাটা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তবু তাঁর এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারলাম না ; শুধু বল্লাম—আপনি ভাববেন না।

খিল খিল করে হেসে ফেললেন তিনি, তারপর চেয়ে দেখি, মাথার কাপড় আরও একটু টেনে দিলেন। ট্রেন এসে ষ্টেশনে দাঁড়াল।

পাশেই ফার্ষ্ট ক্লাস, সেখানে দলে দলে লোকের ভিড়। ফুলের মালা ও তোড়া নিয়ে দলে দলে যুবক এসে কামরার সামনে ভিড় করেছে। নিশ্চয় কোন দেশবরেণ্য নেতা চলেছেন।

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছি দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি দেখছেন ?

বল্লাম—কোন নেতা যাচ্ছেন বোধ হয়। ফার্ষ্ট ক্লাসে তাই লোকের ভিড় হয়েছে।

তিনিও জানালা ঘেসে এসে বসলেন, আমার গায়ে তার নিশ্বাস লাগতে লাগল। মাথার ঘোমটা তেমনি টানা, মুখে যেন চাপা হাসি, খানিকটা আবছা অন্ধকারে তার সবটা যেন অপরূপ রহস্যময় মনে হচ্ছিল।

বাঁশী বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল, উপস্থিত যুবকেরা জানালা গলে মালা তোড়া সব সামনের গাড়িতে নিক্ষেপ করতে লাগল—তারপর তারা জয়ধ্বনি করে উঠল। লক্ষ্য করলাম অটোগ্রাফের খাতা ও কলম হাতে কয়েকজন স্বাক্ষরভিক্ষু হতাশভাবে কি বলাবলি করতে লাগল। আহা বেচারারা স্বাক্ষর পায়নি।

গাড়ি ছেড়ে দিলে তিনি স্বস্থানে ফিরে যাবেন প্রত্যাশা করেছিলাম কিন্তু না যেয়ে আমার পাশেই বসে বল্লেন : যাক্ আপনার কোন বিপদ ঘটেনি।

বিপদ মানে আপনাকে স্ত্রী পরিচয় দিবার কথা বলছেন ? জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। কিন্তু এই লাস্যময়ীর সহজ পরিহাসকে আমি তুচ্ছ মনে করতে চাইলেও কি পারতাম ? তাই বলে ফেললাম : দেখুন—পরের ষ্টেশনে।

এবার আমি কৌতূহল দমন না করে জিজ্ঞাসা করলাম: কিন্তু আপনার পরিচয়ই তো আমায় দিলেন না। অন্তত যাকে কিছুক্ষণের জন্য সঙ্গী পেয়েছি তাকে স্মরণে রাখতে তো দোষ নেই।

মৃদু হেসে বললেন: পরিচয় পেয়ে যদি স্মরণে রাখতে না চান তখন দুঃখ করবেন না কিন্তু।

দুঃখ? কি বলছেন আপনি? আপনি পরিচয় না দিলেও এই ক্ষণ-সান্নিধ্যের সৌভাগ্যের কথা আমি যে কোনদিন ভুলতে পারব সে ভরসা নেই।

তরুণী মাথার কাপড় ফেলে দিলেন। তাঁর অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত মুখাবয়বে ক্ষণ-গাম্ভীর্য নেমে এলো, বল্লেন—সেটা আমারও সৌভাগ্য। কিন্তু কেন পালিয়ে এসে এ গাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি জানলে হয়ত ঘৃণা করবেন। শুধু আমাকে নয়—ঐ যারা ফুলের মালা নিয়ে এসেছিল—ওদের; যারা অটোগ্রাফ পায়নি বলে ব্যর্থ মনে ফিরে গেল—ওদেরও।

ক্ষণিকার মুখে এ কিসের বেদনা ছায়া? এতো প্রত্যাশা করিনি।

চুপ করে গেলাম। না জেনে কোন বেদনার স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছি কে জানে।

যশোর ষ্টেশনে তার সাথে আমিও নামলাম। ফাষ্ট ক্লাসের সামনে তেমনি ভিড়, তেমনি ফুলের মালা, অটোগ্রাফের খাতা, দুই একজন ক্যামেরাম্যান পর্যন্ত। শিক্ষিত বেয়ারা জিনিষপত্র সামলে নামাচ্ছে, জনতা অধীর আগ্রহে কার যেন প্রতীক্ষা করছে।

শেষ পর্যন্ত তাদের নজরে পড়লাম আমরা,—কিছু দূরে দাঁড়িয়েও। ঘিরে ফেল্লে আমাদের, ফুলের মালায় তোড়ায় অন্ধকার। তরুণীটির সঙ্গে আমাকেও তারা বরণ করলে। জয়ধ্বনি উঠল—নন্দিতা দেবীর। হাজার হাত এগিয়ে এলো অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে। বহু চিত্রে বিখ্যাত নন্দিতা দেবী।

মৃদু হেসে তিনি বল্লেন—এই আমার পরিচয় মিষ্টার ব্যানার্জি। এদেরই

হাত হতে রক্ষা পেতে আমি আপনার গাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে এই ক'টি ষ্টেশন কাটিয়েছি। নমস্কার!

বিরাট জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি বিদায় নিলেন, জনতা তার পেছু নিলে। গাড়ীতে বসে দেখি ষ্টেশনময় বড় বড় প্লাকার্ড –বিখ্যাত চিত্রতারকা নন্দিতা দেবীর শুভাগমন! স্থানীয় নাট্যমঞ্চে জলসার অপূর্ব আয়োজন! ইত্যাদি।

ভদ্রলোক চুপ করলেন। তাঁর ঘুম আসতে বিলম্ব হ'ল না! কিন্তু আমি ভাবতে লাগলাম—। এমন রোমান্সের জন্য উৎকণ্ঠিত হলাম না, কিন্তু মনে হল, নন্দিতা দেবী কি মিষ্টার ব্যানার্জির মতো আশ্রয় সত্য সত্যই কামনা করেছিলেন?

---:-:---

বরেন বাবু

বিশাখাপত্তনের সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে জলের গভীর নীল বর্ণের দিকে তাকাতেই আমার বরেন বাবুর কথা মনে পড়ল। কি বিষয়ের সঙ্গে কি বিষয়ের যে সম্বন্ধ সেটা কেবল মনই জানে,. জানিনে কেন—'হে আদি জননী সিন্ধু' বলে উচ্ছ্বাসময় কবিতা উচ্চারণ করবার আগে আমার মনে হল—জলের রং কী গভীর নীল, আহা—ঠিক যেমনটি এঁকেছিলেন আমাদর বরেন বাবু।

আমাদের তখন বয়স অল্প, ইস্কুলেও নিচু ক্লাসে পড়ি। একটা ছুটির দিনে রায়েদের পুকুরে তোলপাড় করে সাঁতার কাটছিলাম আমি, অজিত আর জ্যোতিষ। ওপার হতে এপারে ফিরবার সময় তাকিয়ে দেখি

দু'চারখানা বাসন হাতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন একজন মহিলা, তাঁকে এ পাড়ায় কোনদিন দেখিনি। সাদাসিধে সাড়ী পরা, ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, নিঃসঙ্কোচে তিনি বাসন ধুতে স্নানের ঘাটের এক পাশেই বসলেন।

তিন জোড়া জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে আমরা তাঁর কাছাকাছি সাঁতরে এসে দাঁড়ালাম। তিনিই আমাদের নাম জিজ্ঞেস করলেন। বাসন মাজতে মাজতে কথা বলতে লাগলেন। আমার পরিচয় পেয়ে বল্লেন, ও, কুসুমির ছেলে তুমি। বাঃ বেশ তো। তোমার মাকে নিয়ে আজ বিকেলে এসো আমাদের বাড়ী, বোলো আমি এসেছি, আমার নাম মণি, মণিমালা। চিনবেন তোমার মা।

ঘরে ফিরে মাকে বলতে মা তো অবাক। মণি ফিরল কবে? তাদের বাড়ীতে, মানে তার বাপের বাড়ীতে তো কেউ নেই। শূন্য বাড়ীতে তালা বন্ধ করে মণির ভাই গেছে টার্টানগর, বিয়ে হওয়া অবধি তাই মণির আর দেশে আসা হয়ে ওঠে না।

একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের বাড়ী ও আমার মামাবাড়ী কাছাকাছি, মা এই গ্রামেরই মেয়ে। মণিমালা মায়ের ছোট বেলার সঙ্গিনী হবেন সন্দেহ নেই।

বিকেলের দিকে মা আমাকে নিয়ে রায়েদের বাড়ী গেলেন। পুকুরটা পথের পাশেই, এ পাড়ার সবাই সেখানে স্নান করে, জল আনে। পুকুর পেরিয়ে একটা বড় সুপারিবাগ। তার পরে প্রশস্ত উঠান, দু পাশে দু'খানা টিনের চাল দেওয়া বড় ঘর, মাটির দেওয়াল, কতকাল আগে লেপ দেওয়া হয়েছিল, দীর্ঘদিনের অবহেলায় সে লেপ নীল বর্ণ হয়ে গেছে। উঁচু পোঁতা দেখে মনে হয়, উঠানের আর এক পাশে আর একখানা ঘরও ছিল। কিন্তু তার আর কোন চিহ্ন নেই।

মণিমাসী আমাদের যত্ন করে বসালেন, মায়ের সঙ্গে কত গল্প সল্প

করলেন, কতকাল পরে দু জনে দেখা। তারপর মা যখন উঠলেন এবং পুনরাগমনের অনুরোধের উত্তরে সময়াল্পতার অজুহাত দেখালেন তখন মণিমাসী আমার হাত ধরে বল্লেন, তোমার তো ইস্কুল থেকে ফিরবার পথ এটা, তুমি রোজ আসবে, কেমন ?

মা জিজ্ঞাসা করলেন—মাসীমার ছেলে মেয়ের কথা।

উত্তরে মাসিমা যা বল্লেন তাতে মনে হল, ছেলে মেয়ে হয়নি তাঁর। স্বামীও অসুস্থ।

গেলাম আর একদিন আমি একা। মাসিমা মানুষটিকে আমার ভালো লেগেছিল। সহরের ছাপ কেমন তাতো তখন বুঝিনি, কিন্তু বেশ নজরে লাগত আমার মা কিম্বা পাড়ার আর দশজনের মা খুড়ীর চেয়ে মণিমাসী মানুষটা কত আলাদা।

কিন্তু আমার কাহিনী মণিমাসীকে নিয়ে নয়, বরেন বাবুকে নিয়ে। মায়ের সঙ্গে যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন তাঁকে দেখিনি, যে দিন একা গেলাম, সেদিন দেখলাম। অসুস্থ নন শুধু, একেবারে শয্যাশায়ী। মাসিমা তাঁকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বল্লেন। তারপর হাসিমুখে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এটি আমার সইয়ের ছেলে সন্তোষ, ও বেশ ছবি আঁকতে পারে। বলছিল, তুমি সেরে উঠলে তোমার কাছে ছবি আঁকা শিখবে।

বরেন বাবু,—নামটা তখনও জানি নি, পরে জেনেছিলাম, বক্র দৃষ্টিতে দেখলেন তার কুণ্ঠিত গুণগ্রাহী ছাত্রের দিকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমি না জানি ছবি আঁকতে, না আছে ওদিকে ঝোঁক। ছবি না এঁকে ততক্ষণ কোদাল কোপাতে কিম্বা ওঠ-বস করতেও আমার আপত্তি ছিলনা। তখন আমাদের ছাত্র সমাজের আবহাওয়া অন্য রকম। থাক সে সব কথা।

আমি যে আদৌ ছবি আঁকা শিখবার পক্ষপাতী নই বা বরেন

বাবুর কাছে ছবি আঁকা শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করি নি সেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, মাসিমা উঠে এসে আমার হাত ধরে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন, কথাটা আমার বলাই হ'ল না। মাসিমা আমাকে এক বাটি মুড়ি তেল নুন মেখে খেতে দিয়ে বল্লেন, ছবি আঁকা শিখবে বাবা? উনি খুব চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে দেবেন শিখিয়ে।

মাসিমার ঐকান্তিক আগ্রহের মুখে 'না' বলতে পারলাম না। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে এলাম।

আর একদিন যেয়ে দেখি বরেন বাবু কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুয়ে শুয়ে নিবিষ্ট চিত্তে তিনি একটা ঘড়ির সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ মেরামত করছিলেন। আমি কতক্ষণ পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছি খেয়ালই নেই। এমন নিবিষ্ট হয়ে তিনি কাজ করছেন যে ডাকতে বা কথা বলে ফেলতে ভরসা পাচ্ছিনা। নিকটে মাসিমাকেও দেখতে পাচ্ছিনা, ফিরে আসব কিনা চিন্তা করছিলাম এমন সময় মাসিমা এক কলসী জল নিয়ে ঘরে এলেন। এসেই আমাকে দেখে ডেকে অভ্যর্থনা জানালেন। বরেন বাবু একটু ঘাড় কাত করে দেখে আবার তাঁর কাজে মন দিলেন।

সেদিন ফিরবার আগে বরেন বাবুর সাথে আলাপ হ'ল, সামান্য, কিন্তু তাতে আমার মন যেন কেমন খুশি হ'তে পারল না। তাঁর কথাগুলি যেমন নিস্পৃহ, তেমনি কঠোর। বরেন বাবু স্বল্পভাষী এবং সত্য তথা অপ্রিয়ভাষী। কিন্তু তবু মনে হল, মানুষটা অনেক বড়, যেন এতো বড় যে আমার নাগালের বাইরে। অনেক সময় লাগল আবার আমার মনে গানের কলি গুণ গুণিয়ে ফিরতে।

মাসিমার সেবা যত্নে বরেন বাবু শীঘ্র অনেক পরিমাণে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ঘন ঘন যাতায়াতে আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ ঘনীভূত হল। ইস্কুলপাঠ্য ছাড়া আর কি কি বই আমরা পড়ি, ছাত্রদের শরীর চর্চার উপর ঝোঁক কেমন, ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসাও করতেন।

একদিন যেয়ে দেখি বরেন বাবু একখানা মোটা ইংরাজি বই পড়ছেন। একদিন ঘড়ি সারতে যেমন তন্ময় হয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাব। আমি যে কাছে যেয়ে দাঁড়িয়েছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পাতার পর পাতা উলটে চলেছেন। তাঁর চেহারা তখনও কৃশ, কিন্তু পুরু চশমার ভিতর দিয়ে শানিত দৃষ্টিতে তিনি অতি দ্রুত পাতার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম বইটা ইংরাজির মতই, মনে হল ইংরাজী হরফে ছাপা, কিন্তু চেষ্টা করে তার একটা শব্দও পরিচিত বলে মনে করতে পারলাম না। পরে অবশ্য জেনেছিলাম বইখানা রুশ ভাষায় লেখা এবং বরেন বাবু জানতেন রুশ, জার্মান, ফরাসি, ইতালিয়ান এই চারটে য়ুরোপীয় ভাষা—ইংরাজী বাদে।

আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল বরেন বাবু নিশ্চয় খুব বড় পণ্ডিত। কিন্তু মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পাইনি। মাসিমার একান্ত চেষ্টা দেখতাম বরেন বাবুকে অন্যমনস্ক করে রাখা। তাই কখনো আমি গল্প করতাম, কখনো মাসিমা গল্প করতেন। আর ঘড়ি সারবার বাতিক চাপলে আমরা কেউ ঘাটাতাম না। খুব চমৎকার ঘড়ি সারতে পারতেন বরেন বাবু।

তিনি যে ভালো ছবি আঁকতে পারেন এ কথা সেই প্রথম দিন শুনেছিলাম, কিন্তু এতদিন দেখিনি কিছু নিদর্শন। পাছে আমাকেই ছবি আঁকবার মহড়া দিতে হয় এই ভয়ে ও প্রশ্নটা করতাম না। কিন্তু একদিন যেয়ে দেখি বেরিয়েছে ইজেল, তুলি, রং। বরেন বাবু বসেছেন ছবি আঁকতে। নীল সমুদ্র; দূরে একখানা জাহাজ চলেছে উদয়সূর্যের দিকে মুখ করে। উজ্জ্বল পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে তার মাস্তুল, চিমনি হ'তে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। সমুদ্রের জল কি গভীর নীল, তাতে পড়েছে অরুণ আভা।

রঙ্গিন ছবি যে এমন চমৎকার করে হাতেই আঁকা যায়, তা তখন

আমার জানা ছিল না। ছাপা ছবির পশ্চাতে যে বরেন বাবুর মতো কোন কৃতী শিল্পীর যাদুস্পর্শ লেগে থাকে এ বুঝবার বয়স তখন আমার হয়নি। দেখে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, অবাক হলাম জলের অত গভীর নীল রং দেখে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বরেন বাবু শুধু বলেছিলেন, জলের এতো নীল রং এখনো দেখোনি, দেখবে। বিশাখাপত্তনে এসে সত্যিই তাই দেখলাম এবং দেখে বরেন বাবুকে মনে পড়ে গেল।

যে টুকু বলেছি শুধু এই টুকু হলে বরেন বাবুকে মনে রাখবার কোনো কারণ ঘটত না। বরেন বাবু যে কেন বাড়ির বাইরে যেতেন না, এমন কি বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠবার পরেও, এ প্রশ্ন আমার মনেও না এসেছে এমন নয়। কিন্তু তিনি আমাদের গাঁয়ের জামাই, তার উপর বয়সেও আমার চেয়ে দূরে থাক আমার দাদার চেয়েও ঢের বড়ো, সুতরাং তার সঙ্গী জোটাও দুষ্কর ছিল। বস্তুত বয়সের জন্য ততো নয় যতটা হয়েছিল তার মত ও পথের জন্য, সেটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

একদিন বরেন বাবুর ঘরে দুজন অপরিচিতকে দেখে মাসিমাকে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কোন সঙ্গত জবাব না দিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। পরদিনও সেই দুই ভদ্রলোককে ও বাড়িতে দেখলাম। তারা যে বিদেশী তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, পরন্তু তাদের চালচলন ঠিক স্বাভাবিক মনে হল না। মনে হল তারা যেন লুকিয়ে থাকতে চান, পাছে কেউ দেখে ফেলে তার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি নেই। আমি নেহাৎ ঘরের ছেলের মতো, নতুবা আর কেউ বড় একটা আসেনা এ বাড়িতে। গ্রামের লোকের কাছে এ বাড়িটা পোড়ো বাড়ি হয়েই আছে। যে চাকরটি সঙ্গে এসেছে তাকে বাইরে বলতে শুনলাম, বাবুর আবার অসুখ হয়েছে। কিন্তু নিজের চোখে দেখলাম, বরেন বাবু দিব্যি সুস্থ সবল আছেন, বসে বসে কথা কইচেন সেই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে।

তারপর দিন দুই মাসিমার কাছে যেতে পারিনি। তৃতীয় দিন যেয়ে দেখি, সে ভদ্রলোক দুজন নেই, বরেন বাবুও নেই। মাসীমা জবু থবু হয়ে বসেছিলেন, আমায় দেখে উঠলেন, কথা বল্লেন আমার কথার উত্তরে। কিন্তু তাঁর মনে যে শান্তি নেই সে কথাটা লেখা তাঁর চোখে মুখে।

আমরা কথা বলছি এমন সময় গ্রামের চৌকিদারকে সঙ্গে করে দারোগা কনষ্টেবল কজন এসে উঠানে দাঁড়ালো, জিজ্ঞাসা করল; এটা বিরজানন্দ রায়ের বাড়ি?

মাথার উপর অল্প কাপড় টেনে দিয়ে মাসিমা বল্লেন, হ্যাঁ, আমি তার মেয়ে। কি চাই বলুন?

চাই বরেন সেনকে, বিরজা বাবুর জামাতা ডেটেন্যু বরেন সেন, তাঁকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে।

পরিষ্কার কণ্ঠে মাসিমা বল্লেন,—তিনি তো এখানে থাকেন না। দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলেন, আবার চলে গেছেন। আমি তাঁর স্ত্রী।

দারোগা বল্লেন—কিন্তু দু'চার দিনের জন্য এলেও থানায় খবরটা দেওয়া উচিত ছিল তাঁর। সে যাই হোক, প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় আর নিখিল হালদার নামে দুজন লোক আপনাদের বাড়ি এসেছে?

না। দৃঢ়স্বরে মাসিমা অস্বীকার করলেন।

আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছি তারা এখানে এসেছে, হয়ত এখনো আছে। তাদের নামে ওয়ারেণ্ট আছে, আপনার বাড়ীতে অনুসন্ধান করতে চাই।

'স্বচ্ছন্দে।' মাসিমা বারান্দা হতে উঠানে নেবে দাঁড়ালেন। পুলিশ সব ঘরই আঁতি পাতি করে খুঁজে বেরিয়ে এলো। আর কিছু না পেয়ে খান কয়েক পুরাতন কাগজপত্র ও বই উঠানে এনে ফেললে, তার মধ্যে সেই মোটা রাশিয়ান বই খানাও ছিল, যা সেদিন বরেন বাবু পড়ছিলেন। আপত্তিকর বই বলে বরেন বাবুর খান কয়েক বই নিয়ে গেল পুলিশ।

সবাই চলে গেলে কাছে এসে দাঁড়াল শ্রীনিবাস, মাসিমার বিশ্বস্ত ভৃত্য। তাকেও তিনি অকম্পিত হস্তে বাজারের টাকা বুঝিয়ে দিলেন। টাকা হাতে নিয়েও শ্রীনিবাস দাঁড়িয়ে আছে দেখে মাসিমা বল্লেন,—কি চাও?

শ্রীনিবাস ফুঁপিয়ে উঠলো। সে নাকি ছোট বেলা হোতে মানুষ করেছে মাসিমাকে কোলে পিঠে করে, আজো আছে সঙ্গে। বেদনার্ত স্বরে বল্লে, এবারো তুই বাধা দিলি নে দিদি, এই যে গেলেন আবার কবে ফিরবেন?

মাসিমা কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বল্লেন: বাধা দিলেই কি শুনতেন? অসুখটা একটু কম পড়েচে অবধিই উসখুস করছেন। কত কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বৃথা চলে যাচ্ছে সময়। আমি কোন রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু প্রদোষ আর নিখিলের মুখে সব সংবাদ পেয়ে আর থাকতে রাজি হলেন না কিছুতে। তুমি যাও শ্রীনিবাসদা; ঘরে যে কিছুই নেই। দুটি চাল ডাল এনে দাও তোমাকে ফুটিয়ে দি। তারপর চলো আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

মাসিমা ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, আমিও নিঃশব্দে তার পিছু পিছু গেলাম। তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। কোমর থেকে একটা ভারি জিনিষ নামিয়ে রাখলেন ঘরের পুরাতন সিন্দুকের উপর। অল্প অন্ধকার ঘরের মধ্যেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম—একটি রিভলবার।

আমার পায়ের শব্দ পেতেই মাসিমা রিভলবারটি আঁচল চাপা দিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর হাসিমুখে বল্লেন—তুই যাসনি বুঝি? বোস বাবা। তোর কথা যাওয়ার সময়েও একবার বলেছিলেন। বলেছিলেন লোভ হচ্ছিল, এদের মধ্যে আরো কিছুদিন থেকে যাই। এরা এখনো আছে খাঁটি মানুষ, গড়ে পিটে নিতে পারলে ওদের দ্বারা কাজ পাওয়া যাবে। তোকে ওর বড় ভালো লেগেছিল, বলতেন—ওযে লাঠি ঘোরায়, তুলি টানে না, এটা শুভ লক্ষণ। আজকাল ছাত্রদের মধ্যে প্রাণ জাগছে।

বড় হয়ে অনেক বছর পরে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কথা শুনলাম, শুনলাম মানবেন্দ্র রায়ের কথা। কিন্তু বরেন সেনের নাম শুনিনি আর। রাশিয়ায় জার্মানিতে দৌত্য কার্য করে ভারতের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে আনবার কল্পনা কি একেবারেই বিফল হয়েছে তাঁর?

বরেন বাবুর আঁকা সেই ছবিটা এখন কোথায় কে জানে। সেই যে নীল জলরাশি ভেদ করে চলেছে দূরগামী জলযান উদয়পটে আসীন সূর্যের দিকে মুখ করে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ছে সোনালী আলো কল্পনার রঙ্গে রাঙ্গা। সিন্ধুর এই তীর অবধি সেই আলোয় আলো হয়ে গেছে!

ঠাকুরদার গল্প

ঠাকুরদা বললেন—

গল্প শুনতে চাও—কিন্তু আমাদের যুগের গল্প কি তোমাদের ভালো লাগবে? আমাদের যুগ বলতেই তো তোমরা হেসে উঠে বলবে—

"এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।"—ও গল্প আমরা চাইনে। তা যদি না শুনতে চাও তবে কি বলবো বলো তো!

আমি বললাম—

ঠাকুরদা—ইংরাজিতে একটা কথা আছে, Truth is stranger than fiction, জীবনের সত্য ঘটনাই দু' একটা বলুন, আমাদের ভালো লাগবে।

'তবে শোনো!'—ঠাকুরদা বালাপোষটা জড়িয়ে ভালো করে বসলেন, তারপর বলতে সুরু করলেন—

ছোটবেলায় আমি লেখাপড়ায় ততো ভালো ছিলাম না। তার কারণ

আমি পড়ার চেয়ে খেলা ভালোবাসতাম। কিন্তু যা একবার শুনতাম বা পড়তাম তা সহজে ভুলতাম না। আমি যে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ তে ফাষ্ট হয়েছিহাম, ল' তে ফাষ্ট হয়েছিলাম, ছোট মুনসেফিতে নিয়োগপত্র নিয়ে ক্রমে হাইকোর্টের জাজ অবধি হয়েছিলাম এর সব কিছুর মূলে ছিল দু'টি ছোট ঘটনা। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়—আপাত দৃষ্টিতে যা নগণ্য, তুচ্ছ ঘটনা, তাই এক একজনের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যে হয়ত জীবনে জয়যুক্ত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে জন্মেছে সে তলিয়ে যায়, আর যার দিকে কেউ হেলায় ফিরে তাকায় না সে এসে হাজির হয় সবার পুরোভাগে। ইংরাজী প্রবাদ বাক্যে morning shows the day কথাটায় আমায় বিশ্বাস নেই।

আমিই ছিলাম বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে বখাটে ছেলে। পাড়ার ছেলেদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ান ছিল আমার কাজ। দাদা বরাবর ফাষ্ট হয়ে ক্লাসে উঠতেন, মা বাবার আশা ভরসা সব তাঁর উপর। আর আমি লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় এক ঘটনা ঘটল।

উমেশবাবু ছিলেন আমাদের ইংরাজির মাষ্টার। ভদ্রলোকের মাথায় ছিট্ ছিল। ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি মুখস্ত ছিল। একটা শব্দ বললে তার সমশব্দ গট্‌গট্ করে মুখস্ত বলে যেতে পারতেন। তিনি আমাদের গ্রামার পড়াতেন। গ্রামার আবার এমন শাস্ত্র যা সব সময় মুখস্ত বিদ্যায় কুলায় না, একটু মাথা খেলিয়ে জিনিষটা বুঝতেও হয়।

মৌখিক পরীক্ষায় Parsing জিজ্ঞাসা করছিলেন তিনি। কথাটা ছিল Too poor to give ; গোলযোগ বাধল Verbটি নিয়ে। সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম কৈ ? কেউ নাকি তার জবাব দিতে পারেনি। আমার মুখে উত্তর এসে গেল, বললাম কর্মটা উহ্য আছে।

উমেশবাবু উঠে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—ঠিক্ ঠিক্।

ইংরাজিতে আমি সেইবার ফাষ্ট হলাম। জীবনে প্রথম ফাষ্ট হওয়ার

আনন্দ! হেড্‌মাষ্টার মশাইয়ের ঘোষণা অনুযায়ী আমি একটা পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করলাম।

পুরস্কার বিতরণী সভায় দেখা গেল, হেড মাষ্টারের দেওয়া পুরস্কার ব্যতীত উমেশবাবু নিজেও দিয়েছেন একটা পুরস্কার, ভারি খুসী হয়েছিলেন তিনি। বলেছিতো তার মাথায় ছিট্‌ ছিল। তাই সভায় পুরস্কার দেওয়ার সময় বললেন—আমার নাকি বুদ্ধি আছে, বুঝবার ক্ষমতা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর সেই প্রশংসায় আমার চোখে জল এসে গেল। আমি আনন্দে কেঁদে ফেল্‌লাম।

সেই যে আমার মাথায় কি 'গোঁ' চাপল, ফাষ্ট হওয়ার নেশা—সেটা চাকার জীবনেও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তাই ছোট-মুনসেফ হতে হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হয়েও আমি শেষ পর্যন্ত চাকরী করতে পারলাম না। বোধ হয় আমিই প্রথম সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে পদত্যাগ করি।

কিন্তু এই প্রথম হওরায় নেশায় আমার দ্বারা একটা বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে সমগ্র জীবনেও যার প্রায়শ্চিত্ত করে উঠতে পারিনি।

বলতে বলতে ঠাকুরদার স্বর ভারী হয়ে এলো। আমি বললাম, যা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, সে কথা না হয় থাক্‌।

ঠাকুরদা বললেন,—না, সে কথা তোমাদের বললেও আমার পাপের বোঝা কমবে।

ইংরাজিতে তো ফাষ্ট হলাম, কিন্তু সব বিষয়ে যে ফাষ্ট হল তাকে আর কিছুতে ডিঙুতে পারিনে। এক বছর গেল, দু বছর গেল—আমি যত চেষ্টা করি সেই সেকেণ্ড হওয়ার বেশী আর এগুতে পারিনে। এমন কি একবার ব্যতীত আর ইংরাজিতেও ফাষ্ট হতে পারিনে। যে ফাষ্ট হয়, তার নাম ভবতোষ রায়।

আজো তার চেহারা মনে আছে। গরীবের ছেলে, খালি পা, হাঁটুরে কাচা বাঁধা কাপড় পরা, গায়ে একটা গলাবন্দ কোট। মাথার চুল ছোট

ছোট করে ছাটা। ব্রাহ্মণ, মুখে একটা অপূর্ব সরলতার ছাপ। চোখ দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত, দাঁতগুলি ঝকঝকে।

একা সে সব সাব্জেক্টে ফার্ষ্ট হয়, মাষ্টারেরা তাকে ছেলের মত ভালোবাসেন। বছর বছর গাদা গাদা বই পুরস্কার পায়। আমি তাকে ঈর্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু এমন কোন উপায় খুঁজে পাইনা যাতে তাকে পেছনে ফেলে আগে যেতে পারি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম, ভবতোষ যখনই কোন পড়া বলতে ওঠে, অঙ্ক কষে বা লিখতে বসে, তার গলাবন্ধ কোটের গলার কাছের বোতামটা বামহাতের আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে থাকে। ওর মধ্যে কোন যাদু আছে ভেবে আমিও গলাবন্ধ কোট করিয়ে তার গলার বোতামটা ঘুরিয়ে দেখলাম, কিছুই ফল হল না। ক্রমে আমার যেন জিদ চেপে গেল যে ভবতোষের বোতামটা কেড়ে নিতে হবে। একদিন টিফিনে খেলার সময় টানাটানির মধ্যে তার কোটের গলার বোতাম ছিঁড়ে নিলাম। প্রথমে সে লক্ষ্য করেনি! টিফিনের শেষে আবার ক্লাস বসল। পড়া বলতে যেয়ে অভ্যাস অনুযায়ী তার হাত চলে গেল গলার কাছে, খুঁজতে লাগল বোতামটা, না পেয়ে অন্যমনস্কভাবে এলোমেলো জবাব দিয়ে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে তিরস্কার শুনলে। আমার তখন কি আনন্দ! বোতামটা তখনও আমার পকেটে। একটা ঝিনুকের বড় বোতাম, মাঝে চারটা ছিদ্র ছিল, টানাটানিতে খানিকটা ভেঙ্গে গেছে।

পরদিন হতে ভবতোষকে বড় মনমরা মনে হতে লাগল। ক্রমে পড়াশুনাতেও তার যেন সেই স্বাভাবিক তৎপরতা নষ্ট হয়ে গেল। সে বছর কয়েকটা সাবজেক্টে ফার্ষ্ট হলেও সে মোটমাট সেকেণ্ড হয়ে গেল। আমি ফার্ষ্ট হলাম।

সেই ফার্ষ্ট হওয়ার চাকায় আমি ঘুরে ঘুরে ক্রমে উপরে উঠেছি। তার মধ্যে ভবতোষ যে কখন কোথায় তলিয়ে গেল বুঝতে পারিনি। যদিন

প্রথম লক্ষ্যে পড়ল তখন আমিবি-এ পড়ি; ভবতোষের খোঁজ অনেকদিন হতেই পাইনি। যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন, সে যে কোথায় হারিয়ে গেল জানা গেলনা।

সামান্য একটি বোতামের জন্য একটা জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, তাই নিজের মনেই তর্ক বিতর্ক করেছি অনেক। কিন্তু আজও আমার সন্দেহ হয়, আমার দুর্বুদ্ধির জন্য একটি জীবন অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। এটা কি সত্যই অদ্ভুত নয়?

পরবর্তী জীবনে যখনই সময় পেয়েছি ভবতোষকে খুঁজেছি, পাইনি। আর পাওয়ার আশাও রাখিনে। নিজের স্বার্থের জন্য একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে আমি নিজ হাতে বিনাশ করেছি এ কথা ভাবলেও আমার নিজের উপর ধিক্কার আসে, আমার বিদ্যা, খ্যাতি, ঐশ্বর্য সবই বৃথা মনে হয়।

ঠাকুরদা চুপ করলেন, আমরা জনকয়েক শ্রোতা নীরবে তার বেদনায় সহানুভূতি জানাতে লাগলাম।

খোলস

'বিশাল শালবৃক্ষ'—এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল মণিদাকে অনেক দিন পরে দেখে। শ্যামল কৃষ্ণবর্ণ, স্বাস্থ্যে যৌবনে ভরপুর দীর্ঘায়াত গড়ন, ঋজু মেরুদণ্ড; লালিত্য না থাক, পৌরুষ আছে স্বীকার করতেই হবে।

মণিদাকে আজ আমি প্রথম দেখছিনে; আমারই সে সহপাঠী, হয়ত সমবয়সীও হবে। তবু ওর দীর্ঘ বলিষ্ঠ বপু ও গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলন সহজেই

একটা জ্যেষ্ঠত্বের দাবী জানাতো। তাকে আমি 'মণিদা' বলতাম, তাতে সে কোনদিন আপত্তি করেনি। বরং তার স্বাভাবিক পৌরুষ কণ্ঠে সে আমায় স্নেহ সম্বোধন জানাতো।

মফঃস্বল থেকে বি-এ পাশ করে এম-এ পড়বার ধাঁধাঁয় কলকাতায় এলাম। ছোটবেলা থেকে লিখবার বাতিক ছিল, লিখেও ছিলাম ছোট বড় অনেক কাগজে ছাত্রজীবনে। সেই সূত্রে একটি মাসিকপত্রিকার দপ্তরে ঢোকা গেল। ইচ্ছা, যা আয় হবে, তা দিয়ে নিজের খরচ চালিয়ে এম-এ টা পড়ে ফেলব।

প্রুফে হাত পাকাতে পাকাতে পাণ্ডুলিপিও পড়ে দেখা সুরু করলাম। এবং সেখানেই আবিষ্কার করলাম একজন সত্যিকারের গল্পলিখিয়েকে। তিনি এক মফঃস্বল ইস্কুলের মাষ্টার, নিতান্ত সংকোচের সঙ্গে লেখা পাঠান, লেখা দিয়ে আর ছ'মাসের মধ্যে তাগিদ দেননি। কিন্তু গল্পটা পড়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। এ যেন শরৎচন্দ্র আর তারাশঙ্করের মাঝের হারানো হাইফেনটি, ওদের দুজনেরই আশীর্বাদপুষ্ট তাঁর লেখনী, অথচ কিছু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা নতুন লেখকদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ।

সম্পাদক মশাই গল্পটি ছাপলেন, আবার গল্প পাঠাবার তাগিদ গেল, আবার লেখা এলো। পড়ে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এ কি পাকা বাঁধুনি, কথার কি কারিকুরি, কি অপরিমিত দরদ! সেটিও প্রকাশিত হল।

তারপর আর একটি, তারপর আরো। দু'বছর না ঘুরতে লেখকটি সুপরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁর রচনার সংখ্যা সামান্য, কিন্তু গুণ অসামান্য —আর তার জন্যেই তা সকলেরই নজরে পড়ল। আয়োজন হল তার সম্বর্ধনার।

একদিন অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় মণিদা এলো। কয়েক বছর দেখেনি, গ্রামের তরুলতার মতো কেমন নধর বন্যশ্রীতে মণিদার দেহ ভরে উঠেছে। হাসিমুখে সে এগিয়ে এলো আমার টেবিলের কাছে।

পাশের চেয়ারখানা হতে প্রুফের গাদা সরিয়ে তাকে বসবার যায়গা করে দিলাম। মণিদা কতো সময় বসে গল্প করলে, তারপর এক সময় বিদায় প্রার্থনা করলে। সে যে কি উদ্দেশ্যে এসেছিল তা কিছু আমায় বললে না; আমি ভাবলাম—বুঝি আমার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এসেছিল।

অনেকদিন পরে সাক্ষাত, সুতরাং ঘর সংসারের কথা, দেশের কথা এই সবই হোল অনেকক্ষণ ধরে। পাশ করে এতোকাল দেশে ছিল; যা ছু'-দশ বিঘে ধানের জমি আছে তাতে সম্বৎসরের ভাতের অভাব নেই, পুকুরের মাছ, গাইয়ের দুধ, গাছের আম—অমন বিরাট চেহারার পটভূমি, যেটুকু সে বর্ণনা না করলে তাও আমি অনুভব করলাম। তার সেই দেশ পড়েছে পাকিস্তানে, অতএব—

এতএব মণিদা কলকাতায় এসেচে বৃত্তি ও বাসস্থানের সন্ধানে? হবেও বা। হাজারে হাজারে লাখে লাখে আসচে।

মণিদা উঠে গেলে আমি আবার প্রুফে মনোনিবেশ করলাম। মেসিন প্রুফটা ছাড়তেও কিছু দেরী হয়ে গেল।

আমি সংবাদপত্রসেবী, শহরবাসী ও সাহিত্যবৃত্তিতে লিপ্ত। গ্রাম্য মণিদার কথা ভেবে কেমন কৌতুকের হাসি এলো। বেচারী ভালো মানুষ, ছাপোষা লোক—দিব্যি ছিল গ্রামের ছায়ায় ঘর সংসার গুছিয়ে, একি হাঙ্গামা! একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম, গ্রাম্য লোকের মতো একমুখ পান চিবিয়ে আসেনি মণিদা'। এখন মনে হল, তাই এলেই যেন মানাতো।

মণিদার বিষয়ে আমি চিন্তা করতে পারলাম না বেশীক্ষণ। কতো সময় অপচয় করা যায়! নিতান্ত দরকার হলে বড়জোর না হয় একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখে দেওয়া যায়, তাতে অবশ্যই উপদেশ দেবো মণিদারা ব্যস্ত না হয়ে যে যার পাকিস্তানের ঘরে ফিরে যাক। আমি নিজেও অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের লোক, কিন্তু আমার যাওয়ার সময় নেই। একাধারে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সেবা করি!

মণিদা আমার মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আমার তাড়া আছে, বিকেলে সাহিত্য পরিষদে সেই সাহিত্যিকের সম্বর্ধনা উৎসব আছে। তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাসের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে রবিবাসরের পক্ষ হতে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হবে।

সভার অন্যান্য অনুষ্ঠানের শেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তারই আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম, মাঝে দু-একবার ঘুরে গেলাম সভামণ্ডপের কাছ দিয়ে। কি আশ্চর্য, মরতে মরণ, মণিদা এখানেও এসে জুটেছে! হয়ত জলযোগের লোভেই এসেছে। এসেচে যখন শহরে, দেখে যাক— সাহিত্যিকের দাম কি? হাজার হলেও আমিও তো সাহিত্যবৃত্তিতে লিপ্ত! আর মণিদা কোনো দিন কলেজ ম্যাগাজিনেও একটা লাইন লেখেনি, সাহিত্যিকদের সে রীতিমত কৃপার চক্ষে দেখে!

সভায় প্রথম দিকেই সেই বিশেষ সাহিত্যিকটিকে মাল্যদান করবার কথা। আমার বিস্ফারিত চোখের সুমুখে চমৎকার গোড়ে মালাটী পড়ল যেয়ে মণিদা'র গলায়, যে সমুন্নত কণ্ঠ দেখে বিশাল শাল বৃক্ষের কথাই মনে করেছিলাম।

অবস্থাটা পরিষ্কার হতে বেশী দেরী হলনা, খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল আমার বুকের মধ্যে! গ্রাম্য লোক ভেবে যার সহানুভূতিতে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখবার কল্পনাতেও হাসি পেয়েছিল, সাহিত্যের কিছু বোঝে না ভেবে আমার উন্নাসিক মন যাঁর প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণে কসুর করেনি সেই মণিদাই আজকের সভার সম্মানিত অতিথি! 'বিশাল শাল বৃক্ষ'— কথাটা ভাবতে ভাবতেই আমার কেমন নেশা লাগল। সত্যি কি আশ্চর্য! অমন বিরাট নিরেট চেহারার মধ্যে কি করে লুকিয়ে আছে অতোবড় একটা সৃষ্টিশীল মন। মণিদা'র পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের পাহাড়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে কি গোপন ভাবনির্ঝর—যেন দেখতে ইচ্ছা হয়। সত্যি কি রসিয়ে দরদ দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে তার গল্পটি সে বলে যায়, যেন

চোখের সমুখে একটি করে পাপড়ি খুলে ফুটে ওঠে সহস্রদল পদ্ম, যার সৌরভ আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ ওই অনুপম সৌন্দর্য স্বজনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগুরি যার মগজে খেলা করে বাইরে থেকে তাকে দেখে এতোটুকু ধরবার উপায় নেই। আশ্চর্য মানুষের ক্ষমতা, আর আশ্চর্য তার এই বাইরের পরিচয়।

—:০:—

নবযুগের পাঁচালি

গম গম করছে গঞ্জের হাট; দূর থেকে এর গুঞ্জন শোনা যায়, সে গুঞ্জনে টেনে নিয়ে আসে আশপাশ দশবিশটা গ্রামের মানুষকে। গঞ্জটির নাম ফকিরহাট। পাশ দিয়ে ছোট নদী বয়ে চলেছে, জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে জল ওঠে, ভাটায় নিচে নেবে যায়। জোয়ারের সময় একজন মাঝি খেয়া নৌকায় পারাপার করে, ভাটায় বেশীর ভাগ লোক হেঁটেই পার হয়। নেহাত বেশী বোঝা মাথায় থাকলে কেউ নৌকায় আসে, আর আসে ভদ্রলোকেরা, তাদের পায়ে জুতা না থাক, গায়ে জামা থাকে, নিদেনপক্ষে একটা ফতুয়া কিম্বা গেঞ্জি, আর বামুনপুরুত হলে কাঁধের উপর উড়ুনি।

রাজীব ঠাকুরের কাঁধেও একখানা ময়লা উড়ুনি, গাঁটের ফাঁক দিয়ে সাদা ধপধপে পৈতা বেরিয়ে থাকে খানিকটা। প্রত্যহ স্নানের সময় আঠা দিয়ে মাজা সে পৈতা, শুকিয়ে শক্ত হয়ে থাকে।

আজও রাজীব হাটে এসেছেন। নদীর তীরে খেয়াঘাটের রাস্তা বেঁকে যেখানে বাজারের মধ্যে মিশেছে, সেখানে ট'বাজারের টিনের চালার

কাছে একটা কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ। তার তলাটায় উঁচু উঁচু শিকড় কুমীরের পিঠের মত মাটির উপর দাঁড়া বের করে আছে, পাতা ঝরে পড়েছে বিস্তর। পথে পা-ডোবানো ধূলা হতে কিছুটা দূরে হাটের রাশি রাশি জঞ্জালের বাইরে এই কৃষ্ণচুড়া গাছের তলাটি রাজীব পছন্দ করেন। যাতায়াতের পথ, তাই লোকজন কম আসেনা, কিন্তু বেশী লোক দাঁড়ায় না। তা নাই বা দাঁড়ালো। রাজীবের যারা খরিদ্দার তারা ঠিক তাঁকে সন্ধান করে আসে এই কৃষ্ণচূড়া তলায়। হাঁটের মধ্যে বসে পাঁচু সেখ ব্যাপারী। গোড়াতে মনোহারী মালের চালান আনতো, কিন্তু তাতে ভাগ বসালো গোটা তিনেক বেদে ছোঁড়া। তারা সপ্তাহভর গাঁ-ময় ঘুরে ফিরি করে, আর হাট বারে এসে হাটেও বসে। চুড়ি ফিতা গন্ধতেল আর্শি কাঁকুই এমন সব জিনিষেরই চাহিদা কমে যাচ্ছে দেখে পাঁচু সেখ নতুন কাজ স্বরু করলে, ও আনলে কেতাব। গোপাল ভাঁড়ের গল্প, কীর্ত্তন ও পাঁচালি, সচিত্র প্রেমপত্র, রন্ধনশিক্ষা, গাজীপীরের গান হতে স্ববচনীর ব্রত, শনির পাঁচালি, লক্ষ্মীর ব্রতকথা, বর্ণ পরিচয়, নব ধারাপাত ইত্যাদি। ছু' একখানা রামায়ণ মহাভারত এবং কোরাণ শরিফ আনে মাঝে মাঝে। এতদঞ্চলে আর বইয়ের দোকান নেই, সুতরাং পাঁচু সেখের বই চলতে লাগল।

রাজীব ঠাকুর জানতেন, পাঁচু সেখ শহরের দোকান থেকে পাইকারী দরে ওই-সব ব্রতকথা পাঁচালি বর্ণ পরিচয় প্রভৃতি কিনে আনে। তার দোকানটাও জমকালো। হাটের মাঝখানে একটা বাদাম গাছের তলায় একটা গোটা ত্রিপল বিছিয়ে তার উপর সে বইগুলি সাজিয়ে দেয়। বটতলায় ছাপা কেতাবের কোনোখানার মলাটে জমকালো রঙ্গিন ছবি। পাঁচু সেখ ন্যাতা বুলিয়ে সেগুলি মাঝে মাঝে ঝাড়পোঁছ করে আরো উজ্জ্বল করে রাখে।

আর রাজীব ঠাকুর একটা ছোট চটের থলে পেতে গাছের গুড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তার স্বমুখে রাখা

বই ক'খানির দিকে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবেন এ ব্যবসা তুলে দিয়ে শুধু গুরুগিরিই করবেন। তখনি হয়ত একজন খরিদ্দার আসে, নিয়ে যায় একখানা লক্ষ্মীর ব্রতকথা, দাম ছাপা দুই-আনা, ছয় পয়সাতেই রাজীব রাজি হয়ে যান। উপরের বইখানা তুলে দিলে তার নিচে বেরিয়ে পড়ে আর একখানি হালকা লালচে মলাটের পাতলা চটি বই। মলাটের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্টা লক্ষ্মীর ছবি, কাছের পেচকটিও বাদ পড়েনি। কাঠের ব্লক হতে ছাপা ভালো হয় না, কিন্তু দস্তার ব্লক কিনবার পয়সা সংগ্রহ হয়ে ওঠে না।

এ দেশের দশ বিশ পরগণার মধ্যে রাজীব চক্রবর্তীর ব্রতকথা বিশেষ প্রচলিত---

"দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল গগন
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন ॥
লক্ষ্মী দেবী বামে করি বসি নারায়ণ
করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন ॥
হেনকালে বীণা করে আসি মুনিবর
হরিগুণ গানে মাতি হইয়া বিভোর—"

মুখে মুখে শুনে আবালবৃদ্ধবণিতার মুখস্থ হয়ে আছে। রাজীব চক্রবর্তীর ব্রতকথা না শুনলে এ অঞ্চলে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন বা না হন, গৃহলক্ষ্মীরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। একখানা ছিঁড়লে বা হারালে আর একখানা তাই কিনতেই হয়। আটবার ছাপা হয়েছে এ যাবত, কোনবার ৫০০, কোনবার ৭০০ করে। নেহাত কম কি? তবু যদি পাঁচু সেখ শহর থেকে বই না এনে তাঁর বই চালাতো!

লক্ষ্মীর ব্রতকথার মতো শনির পাঁচালি, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, আসানমারায়ণের ও মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাও রাজীব ঠাকুর লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম, টাকার অষ্টোত্তর শত নাম প্রভৃতিও

লিখেছেন। টাকার একশো আটটা উদ্ভট নাম ঢোকাতে ঢোকাতে মাথায় টাক পড়ে গেলেও টাকা মেলে নি। সব চেয়ে ভালো চলে লক্ষ্মীর ব্রতকথা, তারপর শনির পাঁচালি। লক্ষ্মী আর শনি ব্যতীত অন্য দেব দেবীর উপর রাজীবের ভক্তিটা তাই অটল নয়।

এই সব ইনিয়ে বিনিয়ে পদ্য লেখা বাদেও রাজীবের আর একটা বৃত্তি ছিল। তিনি গাঁয়ের পাঠশালায় পণ্ডিতি করতেন। ছাত্রদের কাছে বিক্রির জন্য একটা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগও লিখেছিলেন। কিন্তু সে পাঠটা প্রথম ভাগেই ঠেকে গেল। তখন পাঠশালার যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি একদিন আর একখানা প্রথমভাগের ভূমিকায় ছাপার অক্ষরে ঘোষণা দেখিয়ে দিলেন: "বিদ্যাসাগরের কৃত বর্ণপরিচয় আর কেহ নকল ও প্রকাশ করিলে আইনত দণ্ডনীয় হইবেন।" ছাপার অক্ষরে লেখা, বিশেষত প্রধান শিক্ষক মশাই যখন দেখিয়েছেন তা তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। ভয়ে ভয়ে রাজীব তার অবিক্রিত বই ক'খানা একদিন চুপি চুপি নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তদবধি বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই আর লেখেন নি বা লিখবার চেষ্টাও করেন নি তিনি।

নতুন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে প্রথমে হাটেই পরিচয় হয়। বয়সে নেহাত ছেলেমানুষ, বছর পঁয়ত্রিশ হবে। তারিয়ে তারিয়ে রাজীবের গ্রন্থকার জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করলেন। নিকটের আর এক জেলায় তার ঘর। রীতিমত গুরুট্রেনিং পাস। বুড়ো পণ্ডিতের স্থানে তিনিই প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন।

রাজীব দেখে খুশি, গুণগ্রাহী ব্যক্তি বলে নতুন পণ্ডিতকে তাঁর চিনতে বাকী ছিল না। পাঠশালার ছুটির পরেও কতদিন উভয়ে কথা হয়, মাঠের আল ধরে চলতে চলতে। নতুন পণ্ডিত বলেন, লক্ষ্মীর ব্রতের উদ্দেশ্যটা কি জানেন ঠাকুর মশাই? ব্রতকথার মধ্যে যে সব সদুপদেশ আপনি লিখেছেন তা পালন করলে আপনা আপনিই

ঘর গৃহস্থালি লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠে। ধর্মবুদ্ধির চেয়ে ওর মধ্যে সমাজবুদ্ধিই বড় কথা।

রাজীব অতো গভীর ভাবে ভেবে দেখেন নি কথাগুলি। লক্ষ্মীর ব্রতকথা তাঁর মৌলিক রচনা নয়। দশজনের মতো তিনিও লিখেছেন। লোকে কেনে, বাড়িতে রাখে, পূজাপার্বনে ব্যবহার করে, সেইতো বড় কথা। তাঁর লেখা বই গৃহলক্ষ্মীরা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করেন, লক্ষ্মীর আসনের কাছে সযত্নে রাখেন এর চেয়ে বড় সম্মান রাজীব কিছু আশা করেন না।

নতুন পণ্ডিত মশাই পরামর্শ দিলেন, একখানা পাঁচালি লিখুন আপনি—নবযুগের পাঁচালি, ছোটরা যা পড়ে শুধু কথাই শিখবে না, মানুষ হবে। শুভঙ্করীর শ্লোকের মতো তৈরী হবে অনেক নতুন শ্লোক যাতে হাতে খড়ি হবে নতুন যুগের মানুষের।

পাখির পালকের কলম তৈরী হল, শ্রীরামপুরের বালি কাগজ এলো এক দিস্তা, চাল পুড়িয়ে সেয়াই তৈরী হল এক ভাঁড়। রাজীব লিখতে বসলেন—নব যুগের পাঁচালি।

নতুন পণ্ডিত অনেক কথাই বলেন, তার সব কথা নতুন নয়, সব কথা সহজ নয়, তবু তার সমস্ত কথাই যে সত্য রাজীবের সন্দেহ থাকেনা একটুও। সারাটা জীবন যা নিয়ে জ্বলেছেন, চোখের সুমুখে জ্বলতে দেখেছেন অগুণতি মানুষকে। সমাজের চাপ, আইনের চাপ। ধনবানের চাপে নিস্পিষ্ট হয়ে গেছে দরিদ্রের পর্ণকুটির, ধূলিতলে মিশে গেছে বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, কোনো প্রতিকার করা সম্ভব হয় নি। দারিদ্র্য বিধাতার অভিশাপ। নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষকে স্বর্গের সিঁড়ি রাজীবই অকুণ্ঠে দেখিয়ে এসেছেন। তাঁর লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে :

"যেবা শুনে যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে,
লক্ষ্মীর বরেতে তার মনোবাঞ্ছা পূরে।

অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন,
ইহলোকে সুখী, অন্তে স্বরগে গমন।

যতো আপাতলোভনীয় কথাই বলুন, আটটি পৃষ্ঠার দরুন নগদ মূল্য ছয়টি পয়সার বেশি তিনি পাননি, প্রত্যাশাও করেননি। লক্ষ্মীর মহিমার এতো বড় ঘোষককেই তাই জীবনভোর কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে।

নতুন পণ্ডিতের কথাগুলি যেন রাজীবের অন্তরাত্মার কথা। এ তো শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী নয়, নয় মঙ্গলচণ্ডীর উপকথা,—এর প্রত্যেকটি কথাই যে রাজীবের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে, মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন তিনি। চিরদীন, চিরলাঞ্ছিত, চিরবুভুক্ষু জনতার বুকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে ঐ একই সুর।

এখন আর টেনে টুনে মিল দিয়ে পদ্য রচনা করা নয়। কথার পর কথা জলের স্রোতের মতো আসতে লাগল। এসে মিলে মিশে একাকার করে সত্যি সত্যি পাতার পর পাতা ভরে দিতে লাগল। লিখে এমন শান্তি, এতো তৃপ্তি রাজীব আর কোন দিন পান নি।

নতুন পণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পড়ে খুশিতে আটখানা, বল্লেন,—এ জিনিষ দেশ লুফে নেবে। শুভঙ্কর নামের অর্থ হল—যে শুভ করে, যা মঙ্গলজনক। আমার মনে হয়—আপনাকে নবযুগের শুভঙ্কর বলবে।

তিনিই উৎসাহের সঙ্গে পাঠশালায় এই পাঁচালি সুরু করলেন। ছাত্রেরা মুখস্ত করতে লাগল, তাদের মুখে নিজের লেখা ছড়া শুনে রাজীবও মেতে উঠলেন।

•

পরবর্তী ঘটনাটা একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল। লক্ষ্মীর পাঁচালি, সুবচনীর ব্রত প্রভৃতি মহকুমা শহরের যে ছাপাখানায় ছাপা হয়েছিল সেখানেই রাজীব তার পাঁচালির পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিতে

গেলেন। ছাপাখানর মালিক শ্রীসদাশয় সান্ন্যাল মহাশয় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফলতিতা গ্রামের লোক, রাজীবের সঙ্গে ছোটবেলায় আলাপ পরিচয় ছিল। তার ছেলেপুলেরাও অনেকে রাজীবের পাঠশালায় পড়ে পাস করে বেরিয়ে কেউ মোক্তার, কেউ ডাক্তার হয়েছে। বড় পৌত্রটি এখন আবার রাজীবের পাঠশালার ছাত্র। সে সম্প্রতি পাঠশালা হতে যে পাঁচালি শিখে এসেছে তা শুনে সদাশয়বাবু ভেবেছিলেন, কোন বকাটে ছোঁড়ার নষ্টামি। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা যে পাঠশালায় রাজপুত্র কোটালপুত্রদের মুণ্ড চর্বন করতে ভরসা পাবেন সে কথা তার আদৌ মনে হয়নি, নতুবা কেউ কি কখনও ছাত্রদের শেখায়—

ভালো করে সবে শোনো
ছোট বড় নেই কোনো।
কোরোনাকো মাতামাতি
ছোটজাতি বড়জাতি।
সব এক, সব ভাই,
দেশময় এই চাই।
কভু নয় ধনবান
গরীবের ভগবান।
অগে বঢ়ো আগে বঢ়ো,
সব কাজে হও দড়ো।

বলে কি এরা? ছোটজাত বড়জাত মানে না নাকি? আরও বড় বড় কথাও ছিল:

ধনে বড় নয়,
গুণে বড় হয়।
ন্যায় নীতি যার
হাতে হাতিয়ার

পৃথিবীতে কার
ধারিবে সে ধার?

'এতো রীতিমতো 'পেডান্‌টিক',—সান্ন্যাল মশাই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে মন্তব্য করেন।

রাজীব অতবড় ভারী ইংরাজি শব্দটা শুনে ঠিক বুঝতে পারলেন না, ভাবলেন নিশ্চয় প্রশংসা করেছেন। সান্ন্যালমশাইও তাঁর গুণগ্রাহী লোক, তাঁর লক্ষ্মীর পাঁচালির তিনিও অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। হাসিমুখে তাই বল্লেন, আজ্ঞে অনেক পরিশ্রম করে লিখেছি বইটা। সবাই বলছেন, বালকদের বিশেষ উপকারে লাগবে। সান্ন্যাল মশাই ততক্ষণে অন্য পৃষ্ঠার মাঝামাঝি পৌঁচেছেন ঃ

প্রবাদে বলে জানে সকলে
তিল কুড়িয়ে তাল,
তেমনি করে উঠিছে ভরে
ভাঁড়ার চিরকাল।
চষে যে জমি, ধরে যে হাল
হা-ভাত তার চিরটা কাল,
ধনীর ঘরে ধানের গোলা ভরা,
মাথার ঘাম পায়েতে ফেলে
খাটিছে যারা চাষী ও জেলে
তাদের মাথে বৃষ্টি আর খরা।
এমন ধারা রবেনা চিরকাল।
পেটের ভাত দিতেই হবে
ছোট কি বড়, বাঁটিয়া সবে
দিতেই হবে......

"দিতেই হবে?" এক রকম খেঁকিয়ে উঠলেন সান্ন্যাল মশাই।

এবার আর রাজীব ভুল করলেন না। বুঝলেন,—একটা কিছু খটকা লেগেছে সান্ন্যাল মশাই-এর। জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ'ল?

"আপনার ধাষ্টামো বন্ধ করুন ঠাকুর, সোজা বলুন কি চান আপনি। কচি কচি ছেলেগুলির মাথা তো চিবিয়ে খাচ্ছেন, আরো এই বই ছাপিয়ে আমার হাতেও দড়ি লাগাতে চান? আপনি তো সোজা পাত্তর ন'ন!

রাজীব চুপ করে গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে হাসতে লাগলেন। এমন প্রসন্ন হাসি কেউ কোনদিন দেখেনি তাঁর মুখে। আগুনের আঁচ লেগেই চিড়বিড় করে উঠেছে রক্ষণশীল চিত্ত। পার্থক্যটা কোথায় ওই ছাপাখানার মালিক সদাশয় সান্ন্যাল আর তাঁর পাঠশালার প্রধান পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধান্তে যেন অনুভব করলেন এক মুহূর্তে। একজন পরিবর্তনের কথা শুনলেও আঁতকে ওঠে, আর একজন পরিবর্তনকে আবাহন করে।

মনে মনে রাজীব সত্যই প্রসন্ন হয়ে উঠলেন, খানিকটা আবৃত্তিই করে ফেল্লেন মনে মনে—

ডাক পাড়ো হাঁক পাড়ো
ভক্তির তাক নাড়ো।
শক্তির চর্চায় সুপ্তির পাপ ঝাড়ো।

তাঁর পাঠশালার ছাত্রেরা নেহাৎ বালক, কিন্তু তারাও একদিন বড় হবে, সমাজ ভাঙবে গড়বে। তাদের দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ রাজীব লোচনের প্রার্থনা জাগে,—

আস্তে নয়, আস্তে নয়,
চেঁচিয়ে বলো, আসচে জয়।
চেঁচিয়ে বলো, আসছে ঝড়,
লুটিয়ে দেবে ধরার পর।
উঁচিয়ে শির চিতিয়ে বুক
যাঁহারা আজ পেতেছে সুখ,

সমাজে পরগাছার দল
লুটিয়া খায় শ্রমের ফল,
ছিনিয়া নেয় জমির ধান,
জিনিয়া নেয় দীনের প্রাণ।
রবে না ভেদ, বাধা নিষেধ
জয়ী হবেই জয়ের জেদ।
আগে বড়ো বড়ো আগে
ঘরে ঘরে প্রাণ জাগে।...

জাগে লাখো লাখো প্রাণ, তাজা সবুজ প্রাণ। রাজীবের পাঁচালির ছড়া ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। ছাত্রদের মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন। এ কল্পনায় রাজীবের চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়।

ফ-র-র-র-ৎ......। পাণ্ডুলিপির বালি কাগজের বাণ্ডিলটা এসে ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। সান্ন্যাল মশাই ধৈর্য হারিয়েছেন। একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র, ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! আঁতকে উঠলেন তিনি। রাজীবের দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভয়লেশহীন স্মিতহাস্যমুখে মেঝে হতে পাণ্ডুলিপির পাতা গুলি কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন।

সান্ন্যাল মশাই আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে প্রেসে একজন সরকারি অফিসার এলেন। কাগজের 'কোটা' তদারক করেন তিনি। সান্ন্যাল মশাই তাকে সম্মুখে পেয়ে যেন একটা আশ্রয় পেলেন, বল্লেন, দেখুন দেখি জুলুম! ইনি বলছেন কাগজের কোটা নেই, বই ছেপে দাও। বলি আমি কি এতই আহাম্মক যে ব্লাক মার্কেটে কাগজ সংগ্রহ করতে যাব! বিনা কোটায় এঁরাই বা বই ছাপেন কি করে?

ইন্‌স্‌পেক্টর রাজীবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বই প্রকাশের ব্যবসা করেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যৎসামান্ত।

'পেপার কোটা' আছে ?

না তো! গত দু' বছরের মধ্যে তো কোন বই ছাপিনি, এসব কথা শুনিও নি।

বাঃ, বেশ তো বইএর ব্যবসা করছেন। কোটা নেই, চালান কি করে, কালো বাজার ?

হাতেনাতে ধরা পড়বার একটা অসহায় কাতর দৃষ্টির প্রত্যাশা করে ভদ্রলোক রাজীবের মুখের দিকে মুরুব্বির দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু সে দৃষ্টিতে ভয় ডর কিছু নেই। রাজীব পূর্বের মতোই হেসে বল্লেন—ও সব কোটাকুটিতো কিছু বুঝি না!

সান্ন্যাল মশাইএর প্ররোচনায় কালোবাজারের কারবারি সন্দেহে রাজীবের বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরী হয়ে গেল। হাসিমুখে তিনি শুনলেন সে কথাও।

পরদিন বাড়ি ফিরতে না ফিরতে চৌকিদারের তাগিদ এলো। থানায় যাওয়ার মুখে ট'বাজারের কাছে রাজীব এসে থমকে দাঁড়ালেন। সেই কৃষ্ণচূড়াতলা—যেখানে চটের থলি বিছিয়ে প্রত্যেক হাটবারে তিনি পাঁচালি বিক্রি করেন সেখানেই কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলছে—তাঁর লেখা নবযুগের পাঁচালির ছড়া। তাদের তেজোদৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রাজীব উৎসাহ পেলেন,—পা চালিয়ে দিলেন থানার দিকে।

—:০:—

পাশের থানায় পুড়ছিল বাড়িঘর, খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গরু বাছুর, রাস্তাঘাট নদীনালা সর্বত্র কিলবিল করছিল অস্ত্রধারী আততায়ী—এই সংবাদ শুনে এ গাঁয়ের বাসিন্দাদের একদলের গেল মুখ শুকিয়ে। সাতপুরুষের বাস্তুভিটা, এ থুয়ে নড়েনি জীবনে কোন দিন। দেখেনি বড় গাঙ পেরিয়ে আছে কোন রাজ্য, সেখানে কোন্ রাজা। জন্মে অবধি এই গাঁয়ের মাটিতে মানুষ, আজ যাব বল্লেই কোথায় যাবে তারা, কোথায় আছে আশ্রয় ?

মাহিন্দির ওরই মধ্যে একটু চটপটে। ছোট বেলায় যাত্রার দলে বালক সাজত,—গলায় সুর ছিল। যাত্রার দলের সঙ্গে ঘুরেছে নানা দেশ, দেখেছে কত বন্দর বাজার গ্রাম বসতি। সব পথঘাট তার মনে নেই, তবু বিশ্বাস আছে, যদি দরকার হয় সে নৌকা খুললে চলে যেতে পারবে কোন ভিন্ গাঁয়ে। জোয়ান চেহারা, আর কিছু না থাক, ইষ্টিমারের ঘাটে কুলির কাজ করেও কি গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে পারবে না ?

কিন্তু মুস্কিল হল মাকে নিয়ে। অবশ্য মেনকার কথাও ভাবতে হয় কিছু। মা বুড়ীমানুষ, নড়তে চায় না তার স্বামীর ভিটা ছেড়ে। এঁটেল মাটি লেপা তুলসীতলায় গড় হয়ে প্রণাম করে বুড়ী নিশ্চিন্ত হয়ে গোরুর জাবর মেখে দেয়, তারপর খেজুর পাতার পাটি বুনতে বসে।

মেনকা তারক খুড়োর মেয়ে। মাহিন্দির তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মাহিন্দিরের মায়েরও পছন্দ, কিন্তু বুড়ো তারক টাকা না পেলে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কেউ সদুপদেশ দিতে এলে বুড়ো দাঁত খিচিয়ে এক কাহন শুনিয়ে দেয়। এ বছরের খন্দ তুলতে পারলে আশা ছিল মাহিন্দির টাকার যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু যেমন শোনা যাচ্ছে চারিদিক, তাতে কখন যে তাদের গাঁয়েই হামেলা হয়ে যায় ঠিক কি !

পথে মেনকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাহিন্দির বল্লে, শুনেছিস মেনকা, চার্দিকে কি সব হাঙ্গাম হচ্ছে।

মেনকা মুচকি হেসে বল্লে : তার তুমি কি করতে চাও।

পালিয়ে যেতে চাই। তোর বাবা কি করবে ঠিক করছে?

বাবা যাবে কুথায়? মা আছে, আমরা ভাই বোনেরা আছি, গরু বাছুর আছে, জমি জেরাত আছে। এ সব ফ্যালাইয়া বাবা যাবে কুথায়?

মাহিন্দির বুঝিয়ে বল্লে—গরু বাছুরের মায়া না করে প্রাণ নিয়ে বাঁচাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। মেনকা অবহেলার হাসি হেসে বল্লে : তুমি পালাও।

কিন্তু কারো পালানো হ'ল না। সন্ধ্যার আগেই তারা এসে পড়ল। অগুণতি লোক, কেউ খালি হাতে আসেনি। জলন্ত মশাল হতে আগুন লাগাল চাষিদের ঘরে। খড়ের ঘর, দাউ দাউ করে জলে উঠল। গরীব গেরস্থ যারা তারা ছেড়া কাঁথা ভাঙ্গা বাসনের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো পথে। কিন্তু তারক সম্পন্ন চাষী। চারটা ধানের মরাই, চারদুয়ারী বড় ঘর জিনিষ পত্রে ঠাসা। হায় হায় করে উঠল তারক, ছেলেমেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এলো তারকের স্ত্রী। কোলের বাচ্চাটা উঠল ডুকরে কেঁদে। ভিড়ের ভিতর মেনকার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কে। মাহিন্দির যখন ছুটে এলো তখন আর মেনকাকে খুঁজে পেল না।

ঝিম ঝিম করছে রাত। একটা গাছতলায় জড়ো হয়ে বসে আছে গ্রামের কজন লোক, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ। কাল তাদের ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হ'বে, নতুবা মৃত্যু।

মাহিন্দিরের মাথাটা চন্ চন্ করছে। অনেক ঘুরেও মেনকার খোঁজ পায়নি সে। হদিস মিলেছে কিছু—সেটা না শুনলেও ক্ষতি ছিল না। পরাণ বেহারা বলেছে সে দেখেছে, ধরে নিয়ে গেছে মেনকাকে। যারা নিয়ে গেছে তারা নিরস্ত্র নয়, তারা ছেড়েও দেবে না। চারদিকে যা ঘটছে তাতে

নিশ্চয় তারা নিজেরা কেউ মেনকাকে বিয়ে করবে। মেনকা কি তাতে রাজি হ'বে ?

হাটু হতে মাথা তুলে দেখলে মাহিন্দির। খানিকদূরে তারক খুড়ো মাথায় গামছা জড়িয়ে পড়ে আছে। বাধা দিতে গিয়েছিল সে আর তার বড় ছেলে যোগীন্দির। যোগীন্দির মারা গেছে তারকের সুমুখেই। তারকের মাথায় লাঠি পড়েছিল, কেটে গেছে কপালের উপরে, কারা ধরাধরি করে গামছা বেঁধে এই গাছতলায় ফেলে রেখেছিল, তদবধি পড়েই আছে। হয়ত জ্ঞান নেই।

রাগ হল মাহিন্দিরের। মেনকার এই অবস্থার জন্য তারকই দায়ী। সে যদি টাকার অজুহাতে মেনকার বিয়েটা বন্ধ করে না রাখত তবে হয়ত মাহিন্দির তাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পারত। বৌ যেতে রাজি হ'লে মাকেও নিশ্চয় রাজি করা যেত। খুব হয়েছে বুড়ো তারকের অপকর্মের শাস্তি।

কিন্তু তাতে তো মেনকা উদ্ধার হবে না। মেনকার অবস্থানের পাত্তা কোথায় পাওয়া যাবে ?

পরদিন অনেকের সাথে মাহিন্দির ধর্মান্তর গ্রহণ করলে। ধর্ম বলতে তার নিজের বেশী কিছু পরিষ্কার ধারণা নেই, সুতরাং তা পরিবর্তনেও প্রবল বাধা কি আছে ? বিশেষত এমন সময় যখন ধর্মান্তর না হলেই জন্মান্তর হওয়ার আশু সম্ভাবনা।

ধর্মান্তরে একটা সুবিধা হল। বেশ পরিবর্তন করে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারল মাহিন্দির। চলে এলো ঘুরতে ঘুরতে অনেকদূরে, আর এক গাঁয়ের কাছাকাছি। পথক্লান্তিতে বসল এসে একটা বটের তলায়। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খাল, বড় নদীতে মিশেছে কিছু দূরে। খালে একখানা নৌকা বাঁধা।

কোথায় যেন কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, মেয়েলি স্বর, গলাটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা। তাকে ধমকাচ্ছে কেউ। কান খাড়া করে শুনলে মাহিন্দির, কথা ও কান্না আসছে নৌকার ছইয়ের ভিতর হ'তে। কিছুক্ষণ পরে খুব খানিক

শাসিয়ে দুইজন জোয়ান লোক নৌকা হ'তে বেরিয়ে চর ভেঙ্গে রাস্তা ধরে অন্য দিকে গেল।

মাহিন্দির বসে বসে দেখতে লাগল, নৌকার গলুইয়ের উপর বসে আছে প্রহরী, অলস আবেশে খালের জলে পা ঝুলিয়ে। মাঝে মাঝে দেখছে চেয়ে এদিক ওদিক, তারপর উঠে গেল ছইয়ের মধ্যে। চারিদিক নির্জন।

তক্ষুণি একটা তর্জন শোনা গেল, শোনা গেল ভাঙ্গা গলার কাতরানি। দুলে উঠল নৌকাটা বারে বারে এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে এলো লোকটা, কপাল হতে ঝরছে রক্ত ধারা। গলুয়ের কাছে এসে সামলাতে না সামলাতে আলুথালু বেশে বেরিয়ে এলো একটা রাক্ষসী মূর্তি, হাতের ক্ষুরধার অস্ত্রে অস্তমিত সূর্যরশ্মি ঝিকমিক করে উঠল। মুহূর্তে মাহিন্দিরের চেতনা যেন লোপ পেয়ে গেল। ভৈরবীর হাতের উন্মুক্ত অসি নররক্তে পুনর্বার রঞ্জিত হল। গলুয়ের উপর লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, আর উঠল না।

এবার সেই উন্মাদিনী নারীমূর্তি পথের দিকে ফিরে তাকাল, যেখানে গাছ তলায় বসেছিল মাহিন্দির। এক দৃষ্টিতে চিনতে পারলে মাহিন্দির, মেনকার এই ভয়ঙ্করী মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি। লজ্জানতা হাস্যমধুরা মেনকা, বুকের ভারে যে ঈষৎ ঝুঁকে চলে, সে বুক উঁচিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পদভরে দুলছে তরণী, তার হাতের অস্ত্র হতে ঝরছে নররক্ত, মাহিন্দিরের চোখের সুমুখে সে আততায়ীকে হত্যা করেছে। তার বেশবাস অবিন্যস্ত, চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে পিঠ জঙ্ঘা ছাড়িয়ে উরু অবধি। পিছনের আকাশ লালে লাল, নদীর ওপারের গ্রামে গৃহদাহ হচ্ছে তারই লেলিহান শিখা উঠেছে আকাশে, উঠছে কালোধুম কুণ্ডলী পাকিয়ে।

মেনকা……মেনকা……ডাকতে ডাকতে নেমে গেল মাহিন্দির। অনভ্যস্ত পরিধেয় বাধতে লাগল পদে পদে। হাটুর উপর গুটিয়ে তুলে নিলে সেটা, তারপর ছুটে গেল নৌকার কাছে।

মেনকা ভীতত্রস্ত চাহনিতে ফিরে তাকাল মাহিন্দিরের দিকে, চিনতে পারল মনে হলনা। উদ্যত অসি নিয়ে এগিয়ে এলো দুই পা, হেঁকে বল্লে—খবরদার।

সে হুমকিতে মাহিন্দিরের পিলে পর্যন্ত চমকে গেল, গায়ের কাঁটা উঠল খাড়া হয়ে। অনভ্যস্ত পরিধেয়টা খুলে পড়ে গেল মাটিতে। নিকষ কালো যেন একটা পাথরে খোদা নগ্ন মূর্তি চরের উপর দাঁড়িয়ে রইল। হাতের অস্ত্র মেনকা নৌকার পাটাতনের উপর সশব্দে ফেলে দিলে।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। মাহিন্দির লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকার উপর। তারপর নৌকার লগি তুলে বেয়ে এনে যখন সে বড় নদীতে ফেল্লে তখন দেখে মেনকার জ্ঞান নেই। আকাশের এক কোণ গৃহদাহের আগুনে লাল হয়ে আছে, তবু নদী, জল ও নদীতীরের বাঁশবন বটঝাড় ছাপিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। কোন দিকে না তাকিয়ে মাহিন্দির ক্ষিপ্র হাতে বৈঠা চালিয়ে দিলে।

তিনবোন

আমার মেয়েরা তাদের মায়ের রূপ পেয়েছে, রূপের খ্যাতি আছে তাদের। তাদের মা নিজে লেখাপড়া জানেন, শেলাই-ফোঁড়াই জানেন,—মেয়েদের শিখিয়েছেন যত্ন করে। তিন মেয়েই গ্রাজুয়েট—একথা ভেবে মনে মনে একটু গর্ববোধ করি বই কি। এবার তাদের কাহিনী বলি শুনুন।

বড় মেয়ের বিয়ের সময় আমার ডাক্তারিতে খুব পশার। দু' হাতে আয় করেছি, ব্যয়ও করেছি দু' হাতে। তাই মেয়ের বিয়েতে খুঁজেপেতে ভালো ঘর বর জুটিয়ে ছিলুম একথা আর বলাই বাহুল্য। পাত্রটি ল'কলেজের

ছোট্ট বাপের বিহারে জমিদারী, বিহারেই বাস, বিরাট বড়লোক। মেয়ে সুখী হবে মনে করে সেখানেই বিয়ে দিয়েছিলাম।

মেজো মেয়ের বিয়ের সময় আমার ছেলে বিলাত থেকে ফিরেছে। তা ধরুন, তাদের তখন নজর উঁচু, ওসব জমিদার গাঁতিদার তাদের নজরে লাগবে কেন? বল্লে, দিদিকে তো হাত পা বেঁধে কুয়োর জলে ছুড়ে ফেলেচো, বুড়ীকে আর সেটি হতে দিচ্ছিনে। বুড়ী আমার মেজো মেয়ের ঘরোয়া নাম। দেখেশুনে তার বিয়ে দিলে পাটনায়, পাত্র ব্যারিষ্টার আর উদীয়মান জাতীয় নেতা—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ আছে।

ছোট মেয়ের বিয়ের সময় গিন্নি কালিম্পং, আমি আমেরিকায় মেডিক্যাল কনফারেন্সে গেছি। তার দাদা-বৌদি নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ছোট মেয়েটি স্বাবলম্বী, একটা প্রচার প্রতিষ্ঠানে চাকুরি জুটিয়েছিল। চেহারা ভাল, লেখাপড়া জানে, বলতে কইতে নাচতে গাইতে কোন বিষয়ে পেছপাও নয়। অফিসেই অপেক্ষা করছিল তার ভাবী বর, ভালোবেসেই বিয়ে করলে তারা। আমাদের অর্থাৎ আমাকে আর তার মাকে পত্র দিয়ে জানিয়েছিল। আমরা আপত্তি করব কেন, আর করলেই বা শুনচে কে? তারা তো ততদিনে হনিমুনে বেরিয়েচে।

দেশে ফিরে প্রাকটিশ থেকে এক রকম অবসর নিয়েছি। ছেলেটি আপনাদের আশীর্বাদে ইতিমধ্যে পশার জমিয়েছে। হবেই বা না কেন? নামকরা ডাক্তারের ছেলে, নিজেও বিলাতফেরত ডাক্তার। তার সুমুখে আমার ডাক্তারি করাটা ভালও দেখায় না, বৌমা তার শাশুড়ীর কাছে আবদারও ধরেছিলেন, বাবা কেন আবার এখন 'কলে' বেরুবেন, তার ছেলে ইয়ংম্যান—সেই খাটুক, তিনি বিশ্রাম করুন। বুঝুন ব্যাপার। এ যুগের মেয়ে তো, কথায় পেরে ওঠে কার সাধ্যি? মানে মানে বিশ্রাম নিয়ে বইপত্রে মাথা গুঁজেছি।

গিন্নির আগ্রহাতিশয্যে একবার ঠিক করলাম—মেয়েদের খোঁজ খবর নেওয়া যাক, ওরা কে কেমন আছে একবার নিজে যেয়ে দেখে আসি।

প্রথমে বিহারে বড় মেয়ের কাছে গেলাম। বড় বাড়ীর বড় বৌ, তেমনি জাঁকজমক—দরোয়ান চাকর-বাকরই বা কতগুলি! আমার জামাতা বাবাজিকে দীর্ঘ কাল পরে দেখে আমি তো চিনতেই পারিনি। ইয়া গোঁফ, ইয়া ভুঁড়ি, মুখটি তাম্বুলরসে রঞ্জিত। ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে গড়গড়ায় তামাক টানছিল। আমার সম্যক পরিচয় পেয়ে তবে উঠে যত্ন আত্তি করলে।

মেয়ের দেখা পেলাম, কিন্তু মেয়েকে খুঁজে পেলাম না তার মধ্যে। ছ'টি ছেলেপুলের মা, জমিদার গৃহিণী, বয়সের ভারে, গহনার ভারে, সংসারের ভারে সে এক আলাদা মানুষ। তার মুখের আদলটি অবশ্য আছে, গায়ের রংও যায়নি একেবারে। কিন্তু আমার স্ত্রী এত সাধ করে ওকে লেখাপড়া গানবাজনা শিখিয়েছিলেন, ও আমাদের প্রথম সন্তান, এখন দেখে মনে হল যেন বন্দিনী সীতা, ঐশ্বর্যের অশোক কাননে বন্দিনী রাজনন্দিনী।

ইচ্ছে করেই তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলাম, মোটা রুচির পরিচয় সর্বত্র। আমি হাঁপিয়ে উঠে পালিয়ে এলাম।

মেজো মেয়ের স্বামী ব্যারিষ্টার, এতদিনে তারও পশার প্রতিপত্তি বেড়েছে। আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জামাতা বাবাজির দেশসেবার মতিও বেড়েছে। আমি যখন গেলাম তখন তার নির্বাচনী বক্তৃতায় দিনের পর দিন কাগজের পাতা ভর্তি হচ্ছে। সফর করে বেড়াচ্ছে সে—তাই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

আমার মেয়েও কম যায় না, সেও একজন ছোটখাটো দেশনেত্রী; পার্টি, সভা, শোভাযাত্রা নিয়ে প্রত্যহ ব্যস্ত। চারদিন ছিলাম তার বাড়ীতে। চারবারও দেখা পাই নি, আসবার সময় তার ছেলেকে বলে এলাম—মাকে নিয়ে একবার মামাবাড়ী বেড়াতে এসো। সে বল্লে—মা'র সময় কোথায়,

আর বাবা যদি ক্যাবিনেটে যান তবে তো তাঁরও সময় হবে না। দাদুর নিজেরও সময় ছিল কি না সেটা আর জিজ্ঞাসা করিনি।

ছোট মেয়ে শিবপুরে থাকে। ওদের দেখেই চলে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু তাই কি আসতে দেয়! মেয়ে আমাকে ধরেতো রাখলেই, আবার লোক পাঠিয়ে তার মাকেও আনিয়ে নিলে। আমার স্ত্রী এই বিয়েতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, হবারই কথা। মা বাবা বর্ত্তমান, কেউ কিছু জানলে না, তারা স্বেচ্ছায় বিয়ে করে বসলে। কিন্তু সব দেখে আমার কাছে যা বল্লেন তার সব কথা লিখলে আপনারা পড়তে পারবেন না। অর্থাৎ তিনি যার-পর-নাই খুশি হয়েছেন।

ছোট্ট একটু বাগানবাড়ীতে তারা থাকে, ফুলের শখ আছে দুজনেরই, তাই বাগান করেছে একটু। লেখাপড়ার শখ যে আছে তা বসবার ঘরে আলম্যারি-র‍্যাক-টেবল্‌গুলিতে ঠাসা ভালো ভালো বই দেখলেই বোঝা যায়। গান বাজনার শখ আমার বরাবর, আমার স্ত্রী তো এই বুড়ো বয়সেও গান বলতে পাগল। আমার জামাতা বাবাজি নিজে চমৎকার গায়, তা ছাড়া একদিন তার বন্ধুবান্ধবীদের ডেকে এমন চমৎকার জলসা শোনালে যে আমরা বুড়োবুড়ী যেন বয়সের তারতম্য ভুলে তাদের সাথে মিশে গেলাম।

আমার স্ত্রীর সব চেযে ভালো লেগেছিল ওদের ছোট্ট বাচ্চাটি, ঠিক মায়ের মতো মিষ্টি আর বাপের মত দুষ্টু হয়েচে। গিন্নিতো তার দাদুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তিন মেয়ের বাড়ী ঘুরে এলাম, এখন ভাবছি বসে বসে। রবীন্দ্রনাথ দুই বোনের কাহিনী নিয়ে চমৎকার উপন্যাস লিখেছিলেন, এই তিন বোনের কাহিনীও কি বিচিত্র রসের সন্ধান দিতে পারে না?

রোমন্থন

বিয়ে হয়ে গেলে নাটক যখন শুরু হবার কথা, তখনই উপন্যাস শেষ হয়। কিন্তু জীবন তো সেখানে থমকে থাকে না, এগিয়ে চলে, তার ইতিহাস তাই আরো বিচিত্র, আরো রহস্যময়, আরো প্রাণবন্ত। পরিচয় যখন নিবিড় হয়, তখনই তাতে সহজ সুরের আমেজ আসে। চাঁদ ও চাতক, রজনী ও রজনীগন্ধা থেকে মন নেবে আসে তেল-নুন-লকড়ির দৈনন্দিন ঘরোয়া পরিবেশে। তাতে রুক্ষতা হয়তো কিছু আছে, সূক্ষ্মতা একেবারে নেই, তাই বা বলি কি করে?

সরোজ ও সবিতার সংসার দূর থেকে দেখলে আর দশজনের মতোই মনে হবে। তারাও খায়-দায়, ছেলেমেয়ে মানুষ করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান হয়, আবার মিলনের বন্যায় ভেসে যায় উষ্মার বিষবাষ্পটুকু। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে হেসে ওঠে দুটি অনাবিল চিত্ত।

সরোজ পিছন ফিরে তাকায়—সতেরো বছর আগের দিনগুলির দিকে। সব সময় যে সহজে সব কিছু নজরে পড়ে তা নয়। দিনযাপনের গ্লানি কম নয়, তার আবিলতায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, কানেও বেশী দূরের বাঁশী আসে না। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে অখণ্ড অবসরে অবিরাম রোমন্থনের অবকাশ জুটল যখন, সরোজ দেখতে চাইল পিছন ফিরে।

সতেরো বছরে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের হালহকিকৎ বদল হয়ে গেছে। লোকের জীবনে যেন কিছুতেই তৃপ্তি নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। যতোই আনো, আরো চাই। খাকৃতি মিটছে না কিছুতে। আয় দুগুণ-তিনগুণ বেড়েছে, খরচ বেড়েছে তার বহুগুণ, চাল বেড়েছে তারো বেশি। জীবনের সহজ আনন্দ কোথায় উবে গেছে।

শুধু কি সরোজের জীবনে, না এমনই আরো অনেকের—প্রশ্নটা নিজের মনেই শুধায় সরোজ। তার বয়স বেড়েছে, পাক ধরেছে মাথার চুলে। সংসারের যাঁরা প্রধান ছিলেন, একে একে বিদায় নিয়েছেন। গোটা দায়িত্ব এখন পড়েছে তার উপর। সে যে সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্থন্দরভাবে বহন করতে পারছে, এমন বৃথা গর্ব তার নেই। তবে হয়ত আরো অনেকের চেয়ে নিতান্ত খারাপভাবে চলছে না তার।

কিন্তু সবিতা কি মনে করে? প্রশ্নটা মনে করে চমকে ওঠে সরোজ। এখন তার সময় হয় না যে সবিতাকে নিয়ে তুদণ্ড গল্প করে—তাই বলে মন থেকেও কি সরে গেছে সে? নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়। মনে মনে না-না বলে অস্বীকৃতির দৃঢ়তায় সে শিরশ্চালন করতে থাকে।

সবিতার সঙ্গে সরোজের বিয়েটাই একটা গোটা উপন্যাসের কাহিনী। লেখকের রুচিমতো তাতে রং ফলিয়ে তুশো থেকে চারশো পৃষ্ঠার কেতাব করা কঠিন নয়। মোট কথা, সরোজ ও সবিতা একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। সরোজ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, মফস্বল শহরে মানুষ। পিসীর বাড়ি পল্লীগ্রামে, সেখানে যেয়ে সবিতাকে দেখে তার ভালো লাগে। লাবণ্যময়ী কুমারীর রূপ তাকে মুগ্ধ করেছিল—তার অতিরিক্ত হয়তো আর কিছু ছিল না। কিন্তু সরোজের চোখে পড়েছিল আরো অনেক কিছু। সবিতার নম্র স্বভাবের মাধুর্য, অকপট আন্তরিকতার আকর্ষণ সে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল। সে যে বড়ো বড়ো পরীক্ষা পাশ করেনি, গাইতে জানে না, নাচতে জানে না, এমনকি, শহরের চালচলনেও নিতান্ত অনভ্যস্ত—সে সব ত্রুটির কিছুই তখন তার চোখ পড়েনি।

বিয়ের ইতিহাসে রং ফলাবো না। তবে রং যে তাদের তুজনের মনেই সমানভাবে লেগেছিল সেটা প্রতিবেশীরাও টের পেতো। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটল কিছুদিন। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নিয়ে যতো হাসি-ঠাট্টা তামাসা চলুক, তারা উভয়ে সেটা গায়ে মাখতো না, উল্টে তারাও সে হাসিতে যোগ দেওয়ার

ব্যাপারটা হাল্কা পরিহাসে পর্যবসিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আর দশজনের সঙ্গে মিশতে সবিতা যাতে লজ্জা না পায়, সরোজ তাতে কম যত্ন নেয়নি। তার নিজের বোন পরের ঘরে গিয়েছিল, প্রতিবেশী সম্পর্কে একটি অনূঢ়া ভগিনীর সঙ্গে সবিতার সখ্য ঘটিয়ে দিয়ে একদিকে সে যেমন সবিতাকে শহুরে ফ্যাশানে চৌপিঠে করে তুলতে লাগল, অপর দিকে রাতে নিজে পড়িয়ে তার প্রবেশিকার পাঠ তৈরি করতে লাগল। দু'বছর পরে পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল—সবিতা দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে।

স্বামী দেবতা। সবিতার কাছে সরোজের অন্য পরিচয় ছিল না। সে যে তাকে কি আদরে অধ্যবসায়ে চার বৎসরের পাঠ দু'বৎসরে শেষ করিয়েছে, তার ইতিহাস আর কেউ না জানুক, সবিতা তো জানে। কৃতজ্ঞতার তার অন্ত ছিল না।

সরোজ ইস্কুল মাষ্টার, ছাত্র পড়াবার কৌশল তার জানা আছে। কিন্তু কেবল কি কৌশলে অসাধ্য সাধন হয়, যদি তার সঙ্গে ছাত্রীরও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না থাকে? সবিতাব ত্রুটি ছিল না। ছোট সংসারের কাজ বেশি নয়, তবু ঝামেলা কম নয়। সব সেরে তবে সে পড়তে বসত। যতদূর সম্ভব লোকের চোখ এড়িয়েই চলেছিল তাদের এই সাধনা। ফল আরো ভালো হলে সরোজ খুশি হত, কিন্তু পাশের খবরটাই সবাই অপার আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন দেখে সরোজেব মনের সেই ছোট আক্ষেপটুকু আর প্রকাশের অবকাশ পেলে না।

ইণ্টারমিডিয়েটও এইভাবে চলল, কিন্তু দুবছরের মাথায় পরীক্ষা দেওয়া হলো না। সবিতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরীক্ষা দেওয়া গেল না। অকালে, হয়ত গুরু পরিশ্রমের ফলেই তার প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে হয়তো সেই প্রথম দুঃখের আবির্ভাব দেখা দিল। কিন্তু তার জন্য দায়ী নয় কেউ।

একটা মন্দ-মধুর লজ্জার আবহাওয়ায় কুসুমিত কামনা এইভাবে বিনষ্ট

হওয়ার বেদনা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে সহ্য করলে। কিন্তু শরীরের উপর যে ধকল গেল, তাতে পড়াশুনার পাট বন্ধ রইল। আর হয়ত সেই বিশ্রামের বিভ্রান্তির মধ্যেই বাসা বাঁধল নতুন প্রত্যাশা। সেই আবেশ, সেই উদ্বেগ, সেই প্রতীক্ষা, সেই উন্মাদনায় দিন কেটে গেল। এবার নবজাতক সুস্থ সবল দেহে সরোজের ঘর আলো করে এলো। সবিতা মা হয়ে গেল।

মেয়েদের এই আর এক রূপ। প্রিয়া নয়—জননী, স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা জগদ্ধাত্রীর জীবন্ত মূর্তি। সরোজ যতো দেখে, ততো ভালো লাগে। এ যেন তার পরিচিত সবিতা নয়, আর এক মানুষ, কোন নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় আঁকা নবীনা জননীর স্নেহ-করুণ চিত্র। দূর থেকে দেখে, নিকট থেকে দেখে—বিস্ময়, আনন্দ, হর্ষোচ্ছ্বাস শত ধারায় বয়ে চলেছে। এক ফোঁটা কচি ছেলেকে ঘিরে এ যেন মায়ারাজ্যের সৃষ্টি। তার চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ, ভিতরে প্রবেশের পথ বন্ধ। দূরে থেকেই সরোজ অনুভব করলে, সবিতা তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে—অথচ তার জন্য বিশেষ বেদনা বোধ হচ্ছে না। হয়ত এমনই হয়, সরোজ বাইরের দিকে চোখ ফেরায়।

বিবাহের পাঁচ বৎসরের মাথায় প্রথম সন্তান, সবার আদর নিয়ে বাড়তে থাকে। একটা টুইশান জুটিয়ে নিতে হয়—কিছু বাড়তি আয় আসা উচিত। সময় যায় কিছু তার পেছনে, কিন্তু এখন আর রাতে তো ঘরে কাউকে পড়াতে হয় না। সময়ের আর মূল্য কি সরোজের?

সতেরো বছর। কতো তার ইতিহাস! সবিতার আরো দুটি সন্তান এসেছে। তাদের নিয়েই সে ব্যস্ত। তাদের স্নান—আহার—বেশভূষা, তার উপর লেখাপড়া, গানবাজনা। সরোজও সরে এসেছে। ইস্কুল, টুইশান, নোট বুক লেখা, এক্জামিনের খাতা দেখা। কতো কাজ। ছুটির জন্যেও জোটানো কতো না ঝঞ্ঝাট। দম ফেলবার ফুরসৎ কোথায়—নিজের

ছেলেমেয়েদের দিকেই তাকাবার সময় হয় না, তা আবার তাদের মা। দূর সতেরো বছর আগের দিনের কথা ভাববার তো অবকাশই নেই।

হয়ত কোনদিনই ভাবনাটা মাথায় আসত না। হঠাৎ রোগটা দেখা দিলে, নতুবা হয়ত এতদিন পরে নতুন করে বেদনা পাওয়ার সুযোগই ঘটত না। যেমন সরে এসেছিল, মরচে ধরে পড়েছিল মননশক্তিতে, তাকে আবার নতুন করে জীবন্ত, উজ্জ্বল করে তুললে এই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিশ্রামের হাতকড়ির বন্ধন।

রোগটা ভালো নয়, সময় থাকতে সে তাই সবে এসেচে। তার ছোঁয়াচ থেকে ছেলেপুলেদের বাঁচাবার দরকার। তাই বলে সবাই তার থেকে দূরে চলে যাবে এতটা কি সরোজ চেয়েছিল?

ডাক্তার বলেছিল, ফুসফুস থেকে রক্ত ঝরচে। সরোজের মনে হল—বুকের উপরেও তো একটা অলক্ষ্য ক্ষতমুখে রক্তের ধারা বইচে, সে ধারা মুছতে চাইলেও মোছে না যে! অশ্রদ্ধা—তাকে সবাই এখন অশ্রদ্ধা করে, সবাই এড়িয়ে যেতে চায়, সবিতাও।

মনে পড়ে কতো কথা। শ্বশুরবাড়ী ফিরে যেয়ে সরোজ সবিতার আর এক রূপ দেখেছিল। শহর থেকে ফিরেছে, সদ্য পরীক্ষায় পাশের গৌরব নিয়ে ফিরেছে সে রাজেন্দ্রাণী। তার মুখে সে কি অপূর্ব আনন্দ-জ্যোতি। স্বামী-সোহাগিনী স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, এ সবই তো তোমার দান! সরোজেরও বুক আনন্দে ভরে গিয়েছিল। সেই কৃতজ্ঞতা, সেই আনন্দ কিসে উবে গেল?

সরোজের রোগটা ধরা পড়বার আগেই সবিতার ব্যবহার বদলেছিল। সংসারে অভাব আছেই—সব ঘরেই কিছু সমান স্বাচ্ছল্য থাকে না। কিন্তু তার জন্য স্বামীকে তাচ্ছিল্য করে লাভ কি? ইস্কুল মাস্টারের পত্নী যদি প্রতিবেশীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেদের জীবনযাত্রার মান তুলনা করে দুঃখ পেতে থাকেন তবে তার উপশম হবে কিসে?

দুঃখটা অভাবের দরুন ততটা নয় যতটা স্বামীর স্বভাবের দরুন। তার স্বামীটি যথেষ্ট সময়োপযোগী নয় বলেই সবিতার ধারণা। যখন সকলেই দু'হাতে উপরি আয়ের ব্যবস্থা করছে তখন ছাঁকা সওয়া শ' টাকার প্রত্যাশায় বসে যে থাকে সে যে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের প্রতিও যথেষ্ট দরদশীল নয় সেকথা অকুণ্ঠে প্রচার করতে সবিতার বাধে না। ভেবে সরোজের হাসি পায়, এই সবিতাকেই সে না নিজে লেখাপড়া শিখিয়েছিল, পরীক্ষা পাশ করিয়েছিল। পাস করলেই যে শিক্ষা হয় না এর আগে এমন নির্মমভাবে বুঝি আর কোন দিন বুঝতে পারেনি সরোজ। যে শিক্ষা মনকে উন্নত করে না সে শিক্ষা অশিক্ষা, কুশিক্ষা।

এর থেকে যে অশ্রদ্ধার সূত্রপাত তার শেষ খুঁজতে খুঁজতে দিনে দিনে নানা তথ্য হাতে আসে, চোখে পড়ে, কানে শোনে। দেহী মাত্রেই দেহাতীত পারমার্থিক শক্তির অধিকারী হয় না। দেহের জৈবধর্মও আছেই, সরোজ তার ব্যতিক্রম নয়। সবিতা সেখানেও ঘা দিতে ছাড়ল না। যার পুত্রকন্যার যথোচিত লালনপালন নির্বাহের ক্ষমতা নেই তার পুত্রকন্যার সাধ কেন? ভদ্রতার মুখোশের মধ্যে একটা নগ্ন কুশ্রীতা ব্যঙ্গ করে ওঠে। সরোজ মাটির দিকে চোখ নামায়। ঝিম ঝিম করতে থাকে মাথার ভিতর।

সবিতার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল একজন কেরাণীর সঙ্গে। যুদ্ধের দৌলতে সেও দু পয়সা কামিয়ে কলকাতায় বাড়ি করে ফেলেছিল। সে একদিন বেড়াতে এলো।

নমিতার নম্র চেহারাটাই সরোজের মনে ছিল, যতদিন যেখানে দেখা হত, সরোজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। বয়সে অন্তত পনের বছরের ছোট, তাছাড়া সরোজ যে সবিতাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছিল নিজের চোখে তার কিছু দেখে এবং মায়ের কাছে তার আদ্যন্ত ইতিহাস শুনে এই ভগিনীপতিটিকে নমিতা সত্যই আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল।

কিন্তু এবার দিদির মুখে তার গুণগান শুনে নমিতার মনও খিঁচড়ে গেল। প্রণাম করা দূরে থাক, কাছেও এলো না, দূরে দাঁড়িয়ে দিদির দুঃখে শোক জ্ঞাপন করে চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে ভগিনীপতিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না। 'পুরুষ জাতটাই এমন, দেখলে গা ঘিন ঘিন করে।"

যাকে নিজের স্ত্রী শ্রদ্ধা করে না, অপরের স্ত্রী তাকে ব্যঙ্গ করবে তাতে আশ্চর্য কি? মনে মনে ভাবে সরোজ।

অথচ সে শ্রদ্ধা হারালো কেন? কি তার অপরাধ?

দেহটা বাদ দিয়ে মন নিয়ে যতদিন কারবার ছিল ততদিন কি সে শ্রদ্ধার পাত্র ছিল? হয়ত তাই। প্লেটনিক লাভ হয়ত সত্যই আদর্শ বস্তু।

কিন্তু বিবাহের জৈবিক তথা দৈহিক দিকটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? দেহের আকাজ্ক্ষা কি কেবল পুরুষের, অপর পক্ষের কিছুই নেই? সম্ভোগের পরিতৃপ্তি কি কেবল একের, অপরের কিছু কি আকাজ্ক্ষা থাকে না। 'না'—বলেই এত বড় সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়া চলে না অথচ দোষের ভাগটা কেন সবই একদিকে পড়ছে?

নমিতাও তাকে ভুল বুঝলে, তাকে ক্ষমা করতে পারল না। যে একদিন পায়ে হাত দিতে নিষেধ করলেও জোর করে প্রণাম করত, সেই এখন ঘৃণা করছে। তার মধ্যে কি আর কিছু কারণ নেই? সরোজের কামনার আগুনে সবিতা যদি পুড়ে ছাই হয়েও যায়, নমিতাকে সে আগুন স্পর্শ করতে পারেনি, অতটা নামতে পারেনি সরোজ। তবে কেন নমিতার এই ব্যবহার? তার স্বামীর সৌভাগ্যলাভ কি কিছু মাত্র প্রেরণা যোগায় নি? নমিতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কি বলছে না, তুমি কামুক না হও কাপুরুষ তো বটেই, উপার্জনের অধিকারে তুমি নিম্নস্তরের, তুমি অপাংক্তেয়! সরোজকে ক্ষমা সবিতাও করে নি। স্মরণ রাখেনি সতেরো বছর আগেকার দিনগুলি। সবিতা এখন শিক্ষিতা মহিলা, চলতে বলতে কিছুতেই কারো থেকে কম যায় না, সে কেন পিছিয়ে থাকবে তার স্বামীর অক্ষমতার জন্য?

সতেরো বছর আগের কাহিনী আজ আর ভেবে লাভ কি? কেউ কি ভাবে, অন্তত নবিতা ভাবে না, ভাবলে এমন ব্যবহার করতে পারত না। পরিবর্তনশীল জগৎ, নতুনের দাবী পুরাতনকে হটিয়ে দেয়। কবে কতোদিন আগে একটি পল্লী কিশোরী লাজনম্রবক্ষে একটি তরুণ যুবকের দিকে প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, আজ মধ্যাহ্ন সূর্যের খরতাপে সেই দূরবিস্তীর্ণ ছায়াময় ছবিখানি যেন মরীচিকার মতো মনে হয়, ওতে যেন সত্যের আলো নেই, নেই তার সবল প্রতিষ্ঠা।

সতেরো বছর আগের সেই যুবকটিও তো বেঁচে নেই। অনেক উত্তাল হাওয়ায় তারও রঙ্গিন পাতাগুলি ঝরে গেছে, সে কবিতা লিখত, কবে তা বন্ধ হয়ে গেছে। সাহিত্য-সাধনার স্রোতটি অনুদার আবহাওয়ায় মাথা গুঁজেছে, ফল্গুধারায় দীর্ঘকাল যা বেঁচে ছিল, হয়ত আজও গভীরভাবে খুঁড়লে প্রস্রবনের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু কে তা করতে চাইবে? যে পারত, সেই সমূলে সবলে উৎসমুখ বন্ধ করেছে।

সরোজ সহজভাবে অবস্থাটা ভাবতে চেষ্টা করে। আমি গৃহিণী, ঘর আমার সত্য, কিন্তু স্বামীও তো আমার। যদি স্বামী আমার মনের মতো ভাবে না চলে, আমি কি তাকে মানিয়ে নিতে পারিনে? তাঁর যদি লেখাপড়ায় শখ, আমি কি চেষ্টা করেও তাতে আগ্রহশীল হতে পারিনে? নেহাৎ আগ্রহশীল নাও যদি হই, বরদাস্ত কি করতে পারিনে? যেমন কিনা আমার শখ সেলাই-তে, তাতে তাঁরও কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু তবু বাধা দিতে আসেই না, বরং কিসে সুবিধা করে দিতে পারবে তার জন্য সূচ সুতা কিনে আনে, সেলাইতে বসলে মেসিনের ঢাকনা খুলে দেয়। চাই একে অপরের কাজে উৎসাহ দেওয়া। নিজেও উৎসাহ বোধ করতে পারি ভালোই, অন্তত বরদাস্ত করা। তা নয়—আমি সইব না আমার ঘর ছেঁড়া কাগজ ছিটিয়ে নোংরা করা। কাগজগুলো কি? না, কবিতার পাণ্ডুলিপি, কি উপন্যাসের খসড়া। যাতে টাকা পয়সা মিলবে না তার যত্ন করে লাভ

কি ? লাভ-লোকসান টাকার অঙ্কে খতিয়ে সব জিনিষের দাম ধরলেই মুস্কিল। আবার টাকা নেই বা বলছ কেন ? উপন্যাসটা বিক্রী হলে টাকা আসবে, যদি সিনেমা হয়, তাতেও টাকা পাবে, নাটক করলেও টাকা। কিসে কি ভাবে টাকা আসবে বলতে পারে কেউ ? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রম্।"

কিন্তু সে বিচার মাথায় এলো না সবিতার, নিজের ইচ্ছা নমিত করতে চাইলে না কোথাও। সে যা ভালো বুঝবে তার উপরে কারো কথা সহ্য করা তার অভ্যাস নয়, সে তা পারবে না।

উপেক্ষা ? একে কি উপেক্ষা বলে ? যদি বলে, সবিতা নাচার। এর থেকে আপ্যায়ন করা তার ধাতের বাইরে ! হাসলে সরোজ। উপেক্ষা সে গায়ে মাখেনি কোনদিন। দীর্ঘ দিন সে একা মেস-জীবন যাপন করেছে, জামার বোতাম লাগাতে, গেঞ্জিতে সাবান দিতে তার বিরক্তি নেই—যদি সময় পায়। এখন সময় পায় না, তা নিয়ে তো সে কোনদিন অভিযোগ করেনি। জামার চারটা ঘরে একটা বোতাম থাকলে ক্ষতি কি, কিন্তু ওই ফাঁক দিয়েই তার বুকে বেদনা বাসা বাঁধতে আসবে তাতো সে বোঝে নি।

ইস্কুল থেকে ট্যুইশানি, তারপর রাতে ঘরে ফিরে এসে খুঁজে পেতে নেয় লুঙ্গিখানা, গামছাখানা। স্যাণ্ডালের এক পাটি আর চটির একপাটি পেলেও খুশি হয়, যদি কিনা দুখানাই এক পায়ের না হয়ে যায়। ক্ষিধে পায়—সেটা জীবধর্ম। ভাত পেতে দেরী হলে রান্নাঘরে তল্লাস নেয়, রুটি হয়ত তখন সবে গড়তে সুরু হয়েছে।

সতেরো বছরের কাহিনীটা তখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আহা, ছেলেপুলের ঘর, একা পেরে ওঠে না। ঠিকা ঝি যদি রাতেও আসতো !

সপ্তাহ শেষে রবিবার। ঘুম ভাঙতে দেরী হলে কথা শুনতে হয়। বাজারে না গেলে উনুনে চড়াবার কিছু নেই সে কথাটা বলবার আগে সরোজের তল্লাস করা উচিত ছিল তরকারির ডালাটা।

বাজার থেকে ফিরে যদি দু'দণ্ড কাগজে মন দিলে অমনি অভিযোগ আসবে, রবিবার দিনটা শুধু শুয়ে বসেই কাটাবে? ছেলেমেয়েগুলো শুধু জন্ম দিয়েই দায় শেষ? ওগুলো মানুষ হবে কি সে? ওদের অঙ্ক ইংরাজিটা ধরলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

গোটা সপ্তাহের একটা রবিবার, সত্যি তো! পরের ছেলেমেয়েকে সপ্তাহভোর তালিম দিচ্ছি আর নিজের ছেলেমেয়েকে সপ্তাহে একদিনও দেখব না! সরোজ কাগজ রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে। মনের মধ্যে একটা ক্লান্ত মন মুখিয়ে থাকে, উপলক্ষ্য পেলেই নিরপরাধ শিশুগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চড়টা চাপড়টা লাগিয়ে আবার নিজেই লজ্জিত হয়, পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে চোখে জলের আভাসও দেখা দেয়! নতেরো বছর আগে একটি তরুণ যুবক একটি তরুণী কিশোরীকে কত ধৈর্য ধরে চার বছরের পড়া দু' বছরে পড়িয়েছিল সেটা যেন ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার মতো উড়ে চলে যায় মনের উপর দিয়ে।

সব কিছুতেই সে অপরাধী, কেন না সে গৃহী হয়েছে অথচ গৃহস্থালি জানে না।

মাঝে মাঝে তবু বিভেদের অন্ত হয়, সরোজ যে সর্বদাই কায়মনপ্রাণে তাই চায়। শান্তি চায়, তৃপ্তি চায়, দিতে চায়, পেতে চায়। তাই যখন কোন দুর্বল মুহূর্তে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে, সরোজ মুখ ফেরায় না, আশ মিটিয়ে দেয়। মনে হয়, এতদিনের সব গ্লানি বুঝি ধুয়ে মুছে গেল এই মিলন মোহানায়। কিন্তু রাতের মোহিনী দিনে নাহিনী সাপের দু'মুখো ছোবল তুলতে ভোলে না। এগুলেও রেহাই নেই, পেছুলেও রেহাই নেই। চুপ করে থাকো তো তুমি—ভিজে বেড়াল, ম্যান্তামুখো। আর যদি জবাব দাও তবে তো কুরুক্ষেত্র। নিরুপায় হয়ে নাকে মুখে দুটি গুঁজে ইস্কুলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অবহেলার মধ্য দিয়েই রোগটা গুটি গুটি এগিয়েছিল। বুকে মাঝে

মাঝে বেদনা লাগত সে কথা বলা হয়নি কাউকে। শুনবার আছে কে? যে ছিল সে এখন এত ছোট কথা শুনতে পায় না। তার ছেলে-মেয়ে-সংসার, কত ঝঞ্ঝাট। এর উপর আবার পুরুষ মানুষের জন্য চিন্তা করবার সময় নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছিল, নিজেকে অত সহজলভ্য করেই হয়ত ভুল করেছে সরোজ। আপোষে মিটিয়ে ফেলতে চেয়েই বিরোধটা জটিল হয়ে গেছে। রোজই একটা প্রবল প্রত্যাশা নিয়ে সে ঘরে ফিরত, হয়ত অন্যায় ব্যবহারের কুজ্ঝটিকা কেটে যাবে, আবার ফিরে আসবে সতরো বছর আগের সহজ সরল দিন, কিন্তু তা আর আসে না।

শুয়ে শুয়ে সরোজ নিজের উপরেই ধিক্কার দিতে লাগল। তার শিক্ষায় নিশ্চয় গলদ ছিল,—গলদ ছিল প্রবল প্রশ্রয়ের মধ্যে। অবাধ ব্যবহারটাই যে কাউকে অবাধ্য করে তুলবে একথা সে ভাবতেই পারেনি।

বারো বছরের ছেলে বিশু কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সরোজ ওর মুখের আদলে একটি তরুণী কিশোরীর মুখের সন্ধান করে। দুচোখ বেয়ে জল নেমে আসে। কবির দৃষ্টি, ভাবুকের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে কান পেতে শোনে—দূরের দিনের চপল কাকলী কিছু কি ভেসে আসে না?

পেট ভরে কলের জল খেয়েছিলাম—সেই অবস্থায় মাইল দশেক হেঁটেছি। সকালে শেষ আধলাটি খরচ করে মুড়িমুড়কি খেয়েছিলাম তা কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। রাতও আটটা হ'ল। কাশী মিত্রের ঘাটে এসে পেট চেপে বসে পড়তে হ'ল। কেমন অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ করছি উদরে না বুকের কলিজায়। পায়ে না সারা শরীর জুড়ে তীব্র অবসাদ আসচে। মাথার পরে মেঘ। যেখানে রাতটা মাথা গুঁজে কাটাই—সেখানটা মাইল তিনেক দূরে দমদমের দিকে। মন না চল্‌লেও পা চালাতে হ'ল, বাগবাজার বেয়ে হাঁটতে সুরু করলাম।

এই পথ,—এখানে ম্যাট্রিক পাস করে আনন্দে প্রথম সিগারেট ধরিয়ে-ছিলাম। এই পথে প্রথম বন্দী হবার সময় বিপুল জয়ধ্বনি পেয়েছিলাম। এই পথে বন্দীজীবন অবসানে পুষ্পমাল্য গলায় দিয়ে মিছিল বেরিয়েছিল আমায় নিয়ে, পত্রিকায় নিয়েছিল ছবি তুলে। নীরবে এবং নিতান্ত একাকী আজ সেই পথ অতিক্রম করে এলাম। পুলের কাছটায় আস্‌তে আস্‌তে বসে পড়তে ইচ্ছা হ'তে লাগল। খাল পার ধরে দেশবন্ধু পার্কের দিকে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। সেখানে ধরিত্রী তার শ্যামলাঞ্চল বিছিয়ে দিয়েছে, আশ্রয় পাব তার ক্রোড়ে।

এখান থেকে আমাদের কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার কত দূর, ট্রাম বা বাস কি ট্যাক্সিতে এলে। ও গুলির আস্বাদ ভুলে গেছি। সনাতন চরণ তরীতে রোজ টালা হ'তে টালিগঞ্জ, শ্যালদা থেকে বালি পর্যন্ত অতিক্রম করছি। ক্লাইভ ষ্ট্রীট আর ক্যানিং ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড আর বড় বাজার

পায়ের তলায়। হয় চাকরি না হয় ব্যবসা একটা কিছু চাই, নইলে জল খেয়ে ক'দিন চলে? ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ আর ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট, আর বড় বাজারে এলেই মন যায় দরাজ হ'য়ে, লাখ দু'লাখ তখন হাতের পাঁচ। বড় ব্যবসায়ী যে আমি হবই এতে আর একটুও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কোনটাতেই সুবিধা করতে পারছিনে। চাকরিতে 'নো ভ্যাকানসি'-নোক্‌রি নেহি, আর ব্যবসায়ে না আছে মূলধন, না পাই কোন সুযোগ। অতএব বিনামূল্যে জল।

কলকাতায় মাটিটুকু পর্যন্ত বিনা পয়সায় মেলে না; আর প্রয়োজনীয় পবিত্র জল তাও কিনা যত্রতত্র প্রচুর এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ধন্যবাদ কর্পোরেশনকে, না হ'লে আমাদের মত যারা বেকার এবং বিপন্ন তাদের উপায় কি ছিল?

যে ভদ্রলোক অযথা থাক্‌বার স্থান দিয়েচেন, কোন কোন দিন তার ঘরে আহারও জুটে যায়। সকালে অতি ব্যস্ত হয়ে বেরুতে হয়, কারণ ওদের যে বারান্দাটায় শুই সে জায়গাতে ওদের সকালেই চা খেতে বস্‌তে হয়, তরকারী কুটতে হয়, পাশেই রান্নাও হব। তবু আমার আশ্রয়দাতাকে অতি ভদ্র বলতে হবে, যেদিন হাঁড়িতে দুটি থাকে আমায় জিজ্ঞাসা করেন আজ দুটি ডাল ভাত চল্‌বে কিনা, কারণ তারা জানেন ভাল হোটেলেই আমার দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নেহাৎ কবি প্রকৃতির মানুষ, তাই আসল কলকাতার অত ঘেঁষাঘেঁষি আমার পছন্দ হয় না। খাওয়াদাওয়ার পরে ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রামে বেলগাছিয়া পর্যন্ত আস্‌তেই হয় নেহাৎ এদিকের মুক্ত হাওয়ার আকর্ষণে। যেদিন সেই শুক্‌নো ভাত আর বিউলি ডালের শেষাংশ জুটে যায় তা অমৃতের মতো লাগে। ওদের একটি ছোট মেয়ে আছে বয়স বছর দশেক, জেগে থাক্‌লে একটু তেঁতুল এনে দেয়। ফোর্থ ক্লাসের একটি ছেলে পড়িয়ে পাঁচ টাকা পাই, তাতে কদিন চলে, তারাও আবার পরিষ্কার জামা কাপড়

আর হাসি খুসি প্রকৃতি প্রত্যাশা করে যার কোনটাই এখন আর আমার পক্ষে সুলভ নয়। রাতেই পড়াতে যাই। ভাগ্যি ওদের বাড়ি বিদ্যুৎ বাতি নেই, হরতকি বাগানের দেড়হাতি এক গলির মধ্যে বাসা, বারমাস সমান অন্ধকার। মিটমিটে হ্যারিকেনে খোকা এ্যালজেবরা কসে, আমি বসে কখনও কল্পনা করি, কখনও বাস্তব জগতে আঘাত খাই।

কিন্তু মেঘ করে যে ঝড় বেড়ে উঠল—গর্জাচ্ছে মেঘ, চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। মুহূর্তে উঠল বাতাস প্রচণ্ড ঝড়ের মতো ধুলোয় গ্যাসের আর বিদ্যুতের আলো গেল ঘোলাটে হয়ে, আমার চারিদিক উঠল সঞ্চারমান হয়ে। পার্কে ছিল ভিড়, ঝড় উঠতে এক দণ্ডে গেল ছত্রভঙ্গ হয়ে একপাল পিপীলিকার মধ্যে একফোঁটা জলের উৎপাতের মত। মাঠের বুকে শুয়েছিলাম, শুধু শুয়ে পড়েছিলাম বল্লে সবটুকু বলা হয় না, একেবারে এলিয়ে পড়েছিলাম। বিচারে বল্‌ছিল উঠে যেতে, কিন্তু না শরীর না মন কোনটাই সায় দিলে না। বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে পড়ে রইলাম। মনে হতে লাগল বুঝি একটা শুকনো পাতার মত উড়ে যাব এই ঝড়ের বেগে।

মন কেন যে এতদিন পরে উঠল আবার আকুল হয়ে? একদিন খুলনায় এক শুকনো পাতার ঝড়ে পড়েছিলাম, আর একদিন বর্ধমানে। খুলনার সেই আম্রকুঞ্জ এই চৈত্রমাসে মঞ্জরীতে ভরে গেছে। সেই সৌরভ, সেই পূর্ণিমা, সবই বুঝি সেখানে আছে শুধু আমি নেই আর নেই সেই চৈত্রনিশীথ। অকারণ সেদিন উঠেছিল প্রবল বাতাস। আমি আশ্রয় নিলাম একটা মেঘনীল গাছের আড়ালে। রূপসায় পালভরে নৌকাগুলি প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে, রিক্ত মাঠের এপারে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বুঝা যায়। চমকিত হলাম,—আমার মত বিপন্ন আর একজন পথিক আশ্রয় নিয়েচে আর একটা গাছের তলে, বাতাসে সামলে রাখতে পারচে না তার শাড়ির আঁচল, ঝটপট করছে গাছের কোলে কোলে।

সঙ্গে ছোট ভাইটি তাড়া দিচ্চে বাড়ী যেতে, সখ নেই তার এ জ্যোৎস্না দেখ্‌তে। দিদি বুঝি ঢেকে রেখেচে ভাইকে তার আঁচল দিয়ে, তবু সে মাঝে মাঝে তাগাদা দিচ্ছে। শুকনো আমের পাতা চিড়বিড় করছে পায়ের কাছে, উড়ে পড়চে মেঘনীলের সংখ্যাতীত লালচে পাতা আমাদের চতুর্দিকে।

আমি এগিয়ে গেলাম, কারণ ভাই বোন্‌কে চিন্‌তে আর দেরী হয় না, মুচমুচে পাতার শব্দে ভাইটি আঁচল থেকে মুখ খুলে, বল্লে, বিকাশদা যে, বাড়ি চলুন না। আমি বললুম, কেমন ঝড় উঠেচে দেখেচ, মজা লাগচে না তোমার? রাস্তায় বড় ধূলো, ভয় নেই, জল হবে না। মেঘ যাচ্ছে উড়ে। বোন্‌টীকে বললাম—কোন সাহসে বেরিয়েচ এমন রাতে?

হেসে ফেল্লে সে, বল্লে—নিজের সাহসটাতেই বুঝি কেবল ভরসা আছে? তবে নেপুকে আনতুম না—এমন ঝড় আসবে জান্‌লে।

সন্ধ্যা থেকে ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে কি জ্যোৎস্নাই ফেটে বেরুচ্ছিল। গ্রীষ্মের রাত্রি, বাইরে বেড়াতে এসেছি, মন ছিল উন্মনা হয়ে। আমাদের ঘিরে ঝরা পাতার ঢেউ উঠল। বল্লাম কি সাহস তোমার, জানোতো এ পাড়াটা নিরাপদ নয়, তাছাড়া পাড়াই বা কৈ? ঐ তো মাত্র দু'চার ঘর বুনো আর বাগদী, আর ঐ বুড়ো গাড়োয়ানের মেয়েটির তো সুনামের অন্ত নেই। সেদিনও পুলিশ কেস হয়েচে জানো। যত সব ইতর লোকের যাতায়াত এদিকে, একজন দেখলেই বা কি বল্‌বে তোমাকে?

সে বলার ভয় আর কারও নেই? যারা যাতায়াত করে সবই কি ইতর, কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে?

প্রচণ্ড সপ্রতিভ ভাবে ও হাসাহাসি করচে দেখে ভাইটীর রাগ হ'ল, সে আবার বাড়ী যাবার তাগিদ জানালে। বোন্‌টি বল্লে কেন, এবার তো তোর বিকাশদা এসেচেন, এখন আর ভয় কি?

আমি বল্লাম—বাতাস নেমেচে, চল, যাওয়াই যাক্‌।

বর্ধমানে সেই ঢেউখেলান মাঠে এমনি এক রাতে একাকী পড়েছিলাম। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে নর্থ ব্রুক কোলিয়ারির দিকে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওদিকে নতুন এলুমিনিয়মের কারখানা খোলা হবে, তারই তোড়জোড় হচ্ছে। ইঁট সাজিয়ে বেড়া দেওয়া টিনের ঘরে মিস্ত্রীরা বাসা বেঁধেছে, রাশি রাশি জিনিষ-পত্র জড়ো করা, দুটা বয়লার শুয়ে আছে, কিছু কিছু কাজ হচ্ছে গাঁথুনি আর খননের। সে সব ছাড়িয়ে একটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। বড় বড় জলা, ধোঁয়ায় কালো তালগাছের সারি আর আঁকা বাঁকা হল্‌দে পথ। আবছা অন্ধকারে একটি ছোট ছেলে ক'টা গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেল, এক জায়গায় তেঁতুল গাছের তলে আঁখ পেষা হচ্ছে। এ সব দেখে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে পথ হারালাম। তেমনি জলা, তেমনি তালগাছ, তেমনি বালুকাময় হল্‌দে নির্জন পথ। সব এক, তবু পথ হারিয়েছি। দূরে মাটির বেড়া আর বিচুলির ছাউনি দেওয়া গ্রামের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। ক্রমে আকাশের রক্তাভা কালো হয়ে গেল, শ্লেট রঙের আকাশ, দূরের চিমনি হতে ধোঁয়া উঠ্‌ছে, ঘড় ঘড় করে নীচে গাড়ী নাম্‌ছে। দূরে বিজলি বাতির সারি।

কোথায় বাতাস ছিল—সহসা এলো তেড়ে, ঝেড়ে দিয়ে গেল পলাশ গাছের ঝরা পাতার রাশি। একটা শাল গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম, কাছে নাম না জানা গাছের সামান্য ঝোপ, চারিদিকে খোলা মাঠে সোঁ সোঁ করে বাতাস আস্‌ছে। দেখলাম জলের কলসী মাথায় করে কে আস্‌চে, যে গাছের তলায় আমি দাঁড়িয়ে সেখানে এসে বল্‌লে,—কে বটে ?

আমি বললাম—ঠিকাদার বাবুর ভাগনে।

নেহাৎ অগ্রাহ্য করে সে এগিয়ে গেল। পায়ে তার নাক উঁচু করা মল, হাতে মোটা রূপার গহনা।

আর কয়েক বছর আগে, আমি তখন পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্র। তখন চেহারায় ছিল জৌলুষ, বসনে ছিল পারিপাট্য, দেহে ছিল সৌরভ, আর দন্তে ছিল শুভ্রতা। লাইমজুসে চুল ছিল চকচকে। সখ করে এমনি এক ঝড়ের মুখে বসেছিলুম কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে। সেদিন ঝড় নেমেচে সন্ধ্যা হ'তে হ'তেই এবং অপ্রত্যাশিত ও অকস্মাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল জনতা। বৃষ্টি ছিল না—তাই আশ্রয় নেয়নি কেউ ছাউনির তলে। একাকী আমি বসেছিলুম খোলা বেঞ্চে জলের দিকে চেয়ে, ঘোলাটে আলোকে জলে পড়েচে রহস্যের ছায়া, ঢেউ বাজছে কিনারে কিনারে। এমন সময় ত্রস্ত পদে বাতাসের দিকে ঝুঁকে বসন চেপে কে এলো। আমার কাছে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে তেমনি চলে গেল। বোধহয় তিনি পশ্চিম দিকের কলেজে পড়েন, বাড়ী হবে পূবে বা উত্তরে, অকারণ তিনি ফিরে এসে বল্‌লেন—এমনভাবে ধূলোর মুখে আত্মসমর্পণ করবেন না। আসুন, অশ্রয় আছে কাছে।

হেদোর পাড়ে, অমন ঝড়ের মুখে—উড়চে তার বসনাঞ্চল, চশমায় জমচে ধুলো। হাতের পুস্তক কঠিন করে ধরা, মনে হ'ল কপালকুণ্ডলা যেন নবকুমারকে ডাকচে। চিনতে পারলাম, বল্‌লাম অনেক দিন পরে দেখা, বোসোনা, তোমার তো দুর্জয় সাহস। মনে আছে খুলনায় সেই ঝড়ের রাত।

সে না বসে বল্‌লে—এখানে না বসে ঘরেই যেয়ে বসবেন, আসুন। উঠুন, উঠুন বলছি,—

গলায় তার আদেশের স্বর, উঠ্‌তে হল, গেলাম সঙ্গে, নিকটেই বাড়ি। তারপর বল্‌লে—স্নান করবেন, ধুলোয় যা চেহারা হয়েচে, আমি তো চিন্‌তেই পারিনি প্রথমে! পিছনে এসে ভুল ভাঙ্গলো।

আমার সামনেটা চেয়ে পিছনটা কেউ বেশী চেনে তা জানতাম না, আশ্চর্য হলাম। বল্‌লাম—স্নান থাক, সেটা বোধহয় পথেই হতে পারবে, জল না নামলেও সম্ভবনা আছে। কিন্তু তুমি কতদিন এখানে?

যতদিন থেকে কলেজে ঢুকেছি—অর্থাৎ এই ক'মাস। দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এই আশ্চর্য! এ বাড়ীটায় নতুন এসেচি। ভাল আছেন তো? কোথায় থাকেন?

ভাবতেও আরাম লাগছে, বলতে পারলাম সুস্থানের কথা, একটা স্কলারসিপ পেয়েছিলাম তাই সংস্থান ছিল, এখন একটা টিউশনি জুটছে না। আর টিউশনির উপর কেন যে আমার এত অশ্রদ্ধা বুঝে পাইনে, নেহাৎ দায়ে ঠেকে পাঁচ টাকার টিউশনিটা আছে, নতুবা পঞ্চাশেও কোনদিন রাজি হইনি।

অনেকদিন পরে দেখতে পেয়ে ওর মা কত খুসী হলেন। নেপু এখন বড় হয়েচে, ইস্কুলে উপরের ক্লাসে পড়ে।

ও বুঝি চা দিয়েছিল। ভাবতেও যেন চায়ের সৌরভ ভেসে আসছে, একবার তাকাতে অবাক হয়ে গেলাম। এ আমি কোথায়—কার বাড়ী অনধিকার প্রবেশ করেছি। এতো পাতিপুকুরের বিজয়বাবুর বাসা নয়, পাটকলের গিরীশবাবুর মাতলামি শোনা যাচ্ছে না, আর নেই সেই পাতিপুকুরের প্রচণ্ডবিক্রম মশকের দাম্ভিক আস্ফালন। সোঁ সোঁ করে যে শব্দ উঠছে, ওযে পাখার শব্দ তা বুঝতে দেরী হ'ল না। পাশের ঘরে চা খাওয়া হচ্ছে, তারই সৌরভ ভেসে আসছে। উঠে বসতে গেলাম, দেখলাম সত্যিই বড় দুর্বল লাগছে। আমার শ্রীহীন কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকাতেও লজ্জা হ'ল। এই ফেনশুভ্র শয্যায় আমি শুয়ে আছি, সজ্ঞানে এবং সপ্রতিভ অবস্থায়?

অকস্মাৎ আবির্ভাব হল, নিশ্চিত সে উদয় হ'ল বুঝি আমার কল্পনায়, আমার স্বপ্নে, আমি বুঝি দেশবন্ধু পার্কে শুয়ে শুয়েই স্বপ্ন দেখচি—সে এসেচে। সে সুন্দর, সে মনোরম, সে পবিত্র। কিন্তু স্বপ্ন নয়, সে এসে

বললে—উঠেছেন? বেশ মানুষ, কি হয়েচে আপনার বলুন তো? এমন বেশে ওখানে ও মাঠে পড়েছিলেন কেন?

সে সীমন্তিনী, সে দীপ্তিমতী—আমার চক্ষু বুজে এলো, বললাম—তুমিই আমায় কুড়িয়ে এনেচ? কিন্তু কেন আনলে?

একটু গরম দুধ খেয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলাম, তারপর স্নানে গেলাম। স্নান থেকে ফিরে এসে বললাম—একটা কথা মনে পড়ল, একবার কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার থেকে আমায় ধরে এনেছিলে, সেদিন স্নান করতে বলেছিলে, হয়ে উঠেনি, আজ বুঝি সেই কথাটাই রাখতে এলাম।

সে হেসে বল্লে, সব আপনার মনে থাকে বিকাশদা, আর সেই খুলনার কাহিনীটা। কিন্তু শরীর যে একেবারে ভেঙ্গে গেছে, ব্যায়াম ছেড়েছেন বুঝি, আর সখ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ওই মাঠে?

হাসি এলো, বললাম—ঝড় ভালোবাসি, সে প্রকৃতিটা এখনও বদলায়নি। কিন্তু ওই প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে তুমি কি পার্কে বেরিয়েছিলে?

না, নেপু এসেছে এখানে, সেই আপনাকে উদ্ধার করেচে, কিন্তু বোধহয় সে চিনতে পারেনি। আসবে এখনি, একটু বাইরে গেছে। কি করচেন এখন?

কি আর করব—পথ পরিক্রমণ।

আর সেই জন্যই এই চেহারা বানিয়েচেন। বাড়ির সঙ্গেও বুঝি অসহযোগ চলছে। আচ্ছা, আমি মজা দেখাচ্ছি। শুনেছিলাম এমনি হয়ে গেছেন আজকাল; এই কলকাতাতেই আছেন তা একদিন মানুষ ভুলেও তো মানুষের কাছে আসে, শেষে যদি আবার স্নান করতে বলে বসি সেই ভয়, নয়? আমার মাথার দিব্যি, আপনি অমন করে বেড়াবেন না।

কতদিন হ'ল এই গৃহের মায়া, আত্মীয়ের আবদার-আদেশ কাটিয়েছি। পরিষ্কার কাপড় পরে গা কেমন শিরশির করছিল। তার স্বামী আসতে

তখনও দেরী আছে। শুনলাম তিনি ব্যবসায়ী, রুটিন ধরে কাজ করা চলে না। তাঁর অফিসের পরে গেছেন আড়ত দেখতে; ফোনে তাই জানা গেল। বাইরে তখন ঝড় থেমেছে, চলছে আবার ট্রাম, বাস, জনপ্রবাহ। সে কি কাজে উঠে গিয়েছিল। নীরবে পথের দিকে আবার আমার দুর্বল পা বাড়ালাম, পিছনে আর ফিরে তাকাইনি।

—::•::—

দুঃস্বপ্ন

আবার সুরু হয়েছে। মন্ত্রীরা বিধান-সভায় কিম্বা সেক্রেটারিয়েটে বসে তারস্বরে কথাটা অস্বীকার করছেন, তবুও ব্যাটারা যেন বিপক্ষ দলের উস্কানি পেয়েই সহরের পথে মরতে এসেছে। কেন, গাঁয়ে কি গাছতলা ছিল না—যেখানে জন্ম হয়েছিল শেষ নিঃশ্বাসটাও না হয় সেই গ্রামের মাটিতেই পড়ত। তবু ম'লে স্বর্গে যেত! আর এখানে? এ যে অপঘাত মৃত্যু, তা সে মাড়োয়ারির মোটরের ধাক্কাতেই মরুক আর মুখে দেবার কিছু না জুটেই মরুক!

শিবশঙ্কর মুখ গোঁজ করে বসে আছে। বিকালে ভাত হয়না অনেক কাল—চাল থাকে না, তাই। রুটি করা হয়েছে মাথা গুণতি করে। ওর থেকে অতগুলি বুভুক্ষুকে দিতে গেলে তাদের জন্য থাকবে না কিছুই! তার অর্থ, তাদের না খেয়ে থেকে অপরকে খেতে দিতে হবে। মন্দ কি? আদর্শের দিক থেকে কত উঁচু সুরের কথা! কিন্তু তার তো না খেয়ে থাকলে আগামীকাল কলে যেয়ে খাটবার সামর্থ্য থাকবে না।

বৌকে সংসারের সব কাজ একা করতে হয়, না খেয়ে সেই বা কেমন করে এতো খাটবে! আর একদিন দিলেই তো ওদের দুঃখু ঘুচবে না— অথচ রোজ সাহায্য করবার মতো ক্ষমতা কৈ শিবশঙ্করের। যাঁদের ক্ষমতা আছে তারা নির্বিকার!

ওদের দোষ কেবল ওরা এদেশে জন্মেছে, নতুবা কাজে-কর্মে কথায়-বার্তায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, চিন্তায়-চরিত্রে ওদের অনেকের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকও জীবনে অনেক উন্নতি করে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবু কি ওরা দুর্ভিক্ষে মরবে?

শিবশঙ্করের গলা দিয়ে রুটি নামতে চায় না, জল খেয়ে নামাতে যেয়ে বিষম লাগল। নিজের বাম হাতের তেলো দিয়ে ঘা দিতে থাকল ব্রহ্মতালুতে। বিষম নামল, কিন্তু সেই মুহূর্তে আবার আকুল আকুতি শোনা গেল—এক টুকরা রুটির জন্য কি কাকুতি! ছোট্ট একরতি ছেলে কোলে একটী কালো মেয়ে এসে ভিক্ষা চাইচে।

পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরের স্মৃতি এখনও দগ্‌দগে হয়ে জ্বলছে মনের পর্দায়। কাতারে কাতারে মানুষ সহরে এলো আর ভেসে চলে গেল। কোথায় গেল? ছটফট করে অনাহারে মরল, তিলে তিলে শুকিয়ে মরল। তবুও এতটুকু প্রতিবাদ নেই। তারা যেন মরবার জন্যই জন্মেছে—এতে বলবার কি আছে! আবার কি সেই দুর্ভিক্ষের প্রেত কালো ছায়া ফেলেছে না? ওই শীর্ণ শিশু কোলে ক্ষুধিত নারীর মূর্তির অন্তরালে কি তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না?

রাত ফরসা হবার আগে একটা কাজ ফয়সালা করা গেল। রেশনের দোকান সাফ করে চাল এনে ফুটপাতে বসেই তিন ইটের উনুনে রান্না চড়ালে তারা। শিবশঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছে। যোগাড় করে দিচ্ছে বাতিল দেওয়া আমের ঝুড়ি উনুনে ইন্ধন জোগাতে। পেট

ভরে খাক্ ওরা—পরে যদি জেল হয়, ফাঁসি হয়, বন্দুকের গুলিতে মাথার খুলি ফাটে সেও ভালো, তবু এক বেলা পেট ভরে খাক ওরা!

লঙ্গরখানার লপসি নয়, নিজেদের রান্না করা দুঃখের দিনের দানা, হয়ত ভালো করে সিদ্ধও হয়নি। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েচে। অব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিস্ফুট প্রতিবাদ জেগে উঠেছে মুমূর্ষু মানুষের মধ্যে। এবার গুলি চলে চলুক, বলুক যার যা খুসী! মুখে মুখে ছড়াক এই অবিশ্বাস্য কাহিনী।

কারখানার সিটি বাজতেই ধড়মড়িয়ে উঠল শিবশঙ্কর, হতভম্বের মতো বসে রইল বিছানায় কিছুক্ষণের জন্য। শেষ রাতের অন্ধকারে থমথম করছে চারিদিক, যেন ক্ষুধিত পাষাণের স্তূপ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চটপট মুখ ধুয়ে গুড় রুটি খেতে যেয়ে দেখে রুটি নেই, রুটির পাত্রটা উপুড় করে ফেলে রেখেছে মানদা তক্তপোষের তলায়। মনে পড়ল সব কথা। রাতে সেই ক্ষুধার্তদের আর্তনাদ। মুখের গ্রাস, ঘরের রুটি তাদের সব ধরে দিয়ে উপবাসী আছে স্বামী-স্ত্রীতে। পথে বেরিয়ে এলো সে। ফুটপাতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মানুষ-কুকুর-গরু, কে খেয়েছে কে খায়নি বোঝবার উপায় নেই, ঘুম এসে সবাইকে গভীরভাবে অচেতন করে দিয়েছে।

যেন মৃতের রাজ্যের মধ্যে প্রসারিত রাজপথ। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই—কেবল গ্যাসের স্তিমিত আলো নিবু নিবু জ্বলছে।

কারখানায় কাজের অবসরে খবরের কাগজ খুলে শিবশঙ্কর সংবাদ পড়ল—কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলার জন্য তিনি চাল পাঠাবেন, কলকাতার খাদ্যসরবরাহ কেন্দ্রীয় সরকার করবে। এবার ভাবছে, আরো মানুষ ভাবছে তবে। সবটাই বোধহয় তবে দুঃস্বপ্ন নয়!

অন্ধকূপ হত্যা

যে স্থানটিতে হলওয়েল মনুমেণ্ট ছিল এখন সেখানে দুই বেলা হাজার মানুষের পদধূলি পড়িতেছে। অফিস ফেরত পথে ধীর মন্থর গতিতে ক্লাইভ ষ্ট্রীট বাহিয়া সেই মোড়টিতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মাস শেষ, পকেটে পয়সা নাই। আসিবার সময় দেরী হইবার ভয়ে তিন পয়সার ট্রামে ঝুলিয়া আসিয়াছি, ফিরিবার সময় পদব্রজেই যাইব। বৈকালের বাতাসটুকু মন্দ লাগিতেছিল না। একবার ভাবিলাম, ডালহৌসী স্কোয়ারে একটু বসিয়াই যাই। পুকুরের পাড়ে মরশুমি ফুল ফুটিয়াছে, সাহেবদের ছেলে মেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে, অস্তমান সন্ধ্যাসূর্য পুকুরের জলেও লাল আভা ফেলিয়াছে। ওদিকে তাকাইয়া থাকিলে কোন কোন দিন আমার বাল্যের গ্রাম্যজীবনের কথা মনে পড়ে, সহসা যেন মনের কোন বদ্ধ বাতায়ন খুলিয়া যায়, এক ঝলক বসন্তের বাতাস ছুটিয়া আসে, নিয়া আসে আনন্দের সুর, উন্মুক্ত আকাশের হাতছানি। কিন্তু আজ মনে পড়িল, অফিসে আসিবার সময়েও শুনিয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া যাইয়া কয়লা না আনিলে রাত্রের রান্না চড়িবে না। সে কারণ পার্কে বসা দূরে থাক, বরং একটু দ্রুতপদেই গৃহে ফিরিবার কথা! তবু শূন্য উদর দ্রুত পদচারণায় সায় দিল না। অগত্যা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া বিড়িটি টানিতে লাগিলাম।

অসংখ্য মানুষ যাইতেছে, কেহ আমার মত দাঁড়াইয়া নাই—ইহাদের দিকে তাকাইয়া আমার একটি কথা সহসা মনে হইল। মনে হইল, সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু যে অন্ধকূপ হত্যার কথা এতকাল শুনিয়া আসিতেছি, যে স্থানে সেই নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া দাবী করা হইত, সেই স্থানেই আজ সহস্র সহস্র লোক ছুটাছুটি করিতেছে। যে স্থানে স্বল্প পরিসর কক্ষে একদল বন্দী মুক্তির আকাঙ্খায়, নিঃশ্বাস টানিবার মত এক

ঝলক বাতাসের আকাঙ্খায় ছটফট করিয়া প্রাণ দিয়াছিল বলা হইত, সেই স্থানেই আজ তড়িতবেগে ট্রামে বাসে মানুষ চলাফেরা করিতেছে, গতির সহস্র দিক খুলিয়া গিয়াছে।

নিজের চিন্তায় মশগুল্ হইয়াছিলাম, পাশ দিয়া গোবিন্দ যাইতেছিল লক্ষ্য করি নাই, আমাকে সে একটা ধাক্কা দিতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। গোবিন্দ দাঁড়াইল না, সময় নাই। আমাকেও সে দাঁড়াইতে দিল না, টানিয়া লইয়া চলিল। আমার মনের কথাটা তাহাকে না বলিয়া পারিলাম না। বলিলাম, অন্ধকূপ হত্যার কথা শুনেচিস্ তো? আমার কিন্তু মনে হয়, সত্যিই যদি ওখানে সেই বন্দীরা মরে থাকে তবে তাদের মৃত আত্মার প্রার্থনাই স্থানটিকে মুক্তিময় করে তুলেছে। তাই এখানেই এত ছুটাছুটি, এত প্রাণ-চাঞ্চল্য।

গোবিন্দ আমার সহপাঠী বন্ধু। এ কথায় সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, তারপর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—কণ্ট্রোল রেটে কিছু বেশী পরিমাণে চাল পেয়েছিস্ না কি যে একেবারে ঐতিহাসিক গবেষণায় ডুবে গেছিস?

অফিস ফেরত পথে গোবিন্দ টুইসানিতে যায়, বৌবাজারে আসিয়া সে অন্য পথ ধরিল। আমি আমার গন্তব্য পথে 'হন হন করিয়া' ছুটিলাম। ঘরে ফিরিয়া বাজারের থলেটি লইয়া আবার যখন পথে নামিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কয়লাওয়ালাকে বলিয়া কহিয়া কিছু কয়লার ব্যবস্থা করিয়া, দুই পয়সার সজিনাডাঁটা, এক পয়সার কুষ্মাণ্ড, দেড় পয়সার উচ্ছে, আধ পয়সার তেঁতুল এবং ইত্যাকার আরও দুই চারিটি জিনিষ কিনিয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম—বারোটি পয়সাই ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে জিনিষটি না হইলে রাত্রের আরামটুকু হয় না সেই এক ছিলিম বালাখানার ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাছে পয়সা থাকিলে আবার বাজারে যাইতে দ্বিধা করিতাম না, কিন্তু না থাকায় নিরস্ত হইতে হইল।

গৃহমধ্যে যাহারা পড়িতেছিল অথবা পড়িবার জন্য বসিয়া বর্তমান যুদ্ধের গতি প্রগতির বিষয়ে বিচক্ষণ মতবাদ প্রচার করিতেছিল, এবার তাহাদের কথা কানে আসিল। শুনিলাম, চট্টগ্রামে আবার বোমা পড়িতেছে। এবার হয়ত আমার মাথাটিতে বোমা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। কেন জানিনা—সংসারের দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে আমার মরিতে সাধ হয়। সংসার যেন একটি বিরাট যন্ত্র, মহানির্ঘোষে ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত চলিতেছে। আমি সেই বিরাট যন্ত্রের অংশ বিশেষ, নিষ্প্রাণ, নিরানন্দ, নীরেট। তবু চাহিদার প্রচণ্ড পেষণে ছুটিতেছি খাটিতেছি। খাইতেছি, তাহাও সেই ছুটাছুটি বজায় রাখিবার জন্য। যেন তাঁতের মাকুর মত একবার অফিস, একবার ঘর এই আমার নির্দিষ্ট নিয়তি। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অহর্নিশি এইভাবে দুলিতে হইবে, একটু অন্যমনস্ক হইলেই কোথাও খাতায় লাল কালির দাগ পড়িয়া গেল, কোথাও রাত্রের রন্ধনের কয়লা বাড়ন্ত হইয়া উঠিল।

বোমার আগমনের আগেই ভাতের আহ্বান আসিল, অগত্যা খাইতে গেলাম। মায়ের কাছে শুনিয়াছি, আমি নাকি সজিনার ডাঁটা ভালবাসি, অল্প বয়সে নাকি সজিনাকে 'সজনী' বলিতাম, সে কথা কাহারও কাহারও হয়ত মনে আছে। কিন্তু বয়স তো আমার একার বাড়ে নাই, তাঁহাদেরও বাড়িয়াছে, তাই অভ্যাসদোষে যখন 'সজনী'র সন্ধান করিয়া ফেলিলাম, তাঁহারা হেঁসেল বিভাগ হইতে স্পষ্ট কণ্ঠে জানাইলেন, বৈকালের বাজার কাল সকালের জন্য। তবে তেঁতুলটুকুর কথা স্বতন্ত্র এ কথা অবশ্য আমি জানিলেও বলিলাম না। খাইয়া উঠিয়া আসিলাম, যন্ত্রে তৈল-নিষেক হইল, যাহাতে পরদিবস নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চলে। আজ আর অম্বুরিও নাই, বালাখানাও নাই, অগত্যা আর একটি বিড়ি টানিয়া বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সকাল সকাল উঠিতে হয়। পৈতৃক উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্রটি এখনও ছাড়িতে পারি নাই। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, ভিজা গামছা পরিয়া, পূর্বাস্য হইয়া

গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া লই। সবিতার রূপ স্মরণ হইলেই মনে হয়—বেলা বাড়িতেছে। বৃদ্ধাঙ্গুলি সবেগে অনামিকা কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও তর্জনীর উপর বুলাইতে থাকি। কোনদিন দাড়ি কামাইতে যাইয়া বেলা হইয়া যায়, কোনদিন বাজার সারিতে স্নানের সময় থাকে না। কলতলায় যাইয়া এক বালতি জল ব্রহ্মতালুতে ঢালিয়া দিয়া ভাতের জন্য হাঁক দিতে থাকি। খাইয়া উঠিয়াই তিন পয়সার ট্রাম, তারপর সারাদিন টাকা আনা পাই, হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকার হিসাব কসি। ছুটির শেষে পথে বাহির হইয়া মনে পড়ে,—মাসের শেষ, হাজার হাজার, লাখ লাখ দূরে থাক, ঘরে ফিরিবার ট্রামের পয়সাটিও পকেটে নাই। অগত্যা হণ্টনের পূর্বে হলওয়েল মনুমেণ্টের মোড়ে দাঁড়াইয়া ডালহৌসি স্কোয়ারের সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি আর মরশুমি ফুলের বিছানাগুলির দিকে তাকাইতে তাকাইতে একটি বিড়ি ধরাই।

বোমার ভয় আমাদের আর নাই, মৃতের আবার মৃত্যুভয় কি? আমরা কি বাঁচিয়া আছি? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আজ আবার হলওয়েল মনুমেণ্টের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হলওয়েল মনুমেণ্ট নাই, দুই বেলা সেখানে অজস্র যান-বাহনের ভীড়। অন্ধকূপ হত্যার প্রবাদ সত্য কি না ঐতিহাসিকেরাই জানেন, কিন্তু আজ চার্ণকপ্লেসের মোড়ে দাঁড়াইয়া অন্ধকূপ হত্যার স্বরূপ আমি নূতনভাবে অনুভব করিলাম। যে অপরিসর কক্ষে বন্দীরা একটু নিঃশ্বাসের বাতাসের অভাবে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, মৃত্যুকালে তাহাদের উৎসারিত অভিসম্পাতে আমাদের সমগ্র জীবন তদপেক্ষা অপরিসর ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা কয়েক ঘণ্টা নিঃশ্বাস লইতে না পারিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু আমরা সমগ্র কর্মজীবন ধরিয়া নিঃশ্বাসের বাতাসের মতই একটু বিরাম বিশ্রামের মুহূর্তের জন্য আকুলভাবে আকাঙ্খিত থাকি, মৃত্যু যন্ত্রণার অপেক্ষাও তীব্র যন্ত্রণা তিলে তিলে দিনে আমাদের ক্ষয় করিতে থাকে। আমি একা নই, অগ্রে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিলাম—অগণিত জনতা। বাহ্যত তাহারা চলিতেছে বটে, কিন্তু সে শুধু

সেই বদ্ধ কক্ষে ছটফট করা ছাড়া আর কিছু নয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদেরও অন্ধকূপ হত্যা হইতেছে। এ কূপে আকাশের আলো বাতাস কেবল আসে না তাই নয়, মানুষগুলির জীবন হইতেও তাহা মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই ঘণ্টা বাঁধা যান্ত্রিক জীবনের বাহিরে যে কিছু আছে, পৃথিবীতে যে রূপ, রস, আনন্দ আছে সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই নিরুদ্ধ জীবনে আমরা তিলে তিলে মরিতেছি, সহস্রে সহস্রে মরিতেছি, বংশ পরম্পরায় মরিতেছি, জাতি হিসাবে মরিতেছি। সরকারী ও সওদাগরি দপ্তরখানায় কলমের গারদে আমাদের জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আছে। হয়ত উপার্জন বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অশেষ উপসর্গও বাড়িয়াছে। দার্শনিকের বংশধর, শান্তিপ্রিয়, চিন্তাশীলের স্কন্ধে সময়ের চুলচেরা হিসাবের বোঝা চাপিয়া তাহার কণ্ঠশ্বাস রোধ করিয়াছে, পরপদ-সেবাবৃত্তি তাহার চিত্তের শান্তি ও চিন্তার ব্যাপ্তি ব্যাহত করিয়াছে। সে যে নিত্য নিয়ত আপন ক্ষুদ্রায়তনের প্রাচীরে মাথা কুটিয়া মরিতেছে, কোন্ মনুমেণ্ট অপসরণে এই অপবাদ ঘুচিতে পারিবে? (১৩৫০)

কালিঘাটের গেঞ্জি

প্রবেশিকা পরীক্ষার মুখে যে ছাত্রীটি হাতে আসিয়া পড়িল তাহাকে শিক্ষা দিতে যাইয়া অনেকটা শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি। ইহাতে আমার দুঃখ নাই, বরং মেয়েদের উপর শ্রদ্ধা বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে।

নাম তার নমিতা নন্দী: নামের মধ্যে যে মানুষের কোনও সত্যিকার সান্নিধ্য থাকে সে কথা তাহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।

প্রথমাবধি লক্ষ্য করিলাম—এত শান্ত, এত সরল সুন্দর মেয়ে আমি আর দেখি নাই। তাহার নির্বিকার মুখশ্রীর অটল সৌম্য রূপ যেন বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলে। মনে হয়, কামনার উন্মাদ হস্ত সেখানে নিস্তেজ হইয়া মধুময় কল্পনার আশ্রয় নেয়।

নমিতা পড়িতেই চাহিত, অথচ আমি ঠিক সকল সময় পড়াইতে চাহিতাম না। হয়ত সে কথা সে বুঝিত, জানিতে পারিত—কত সামান্য উপলক্ষ নিয়া আমি কত বাজে বকি, আর কত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও অলক্ষ্যে এড়াইয়া যাই। সে বুঝিত, হয়ত কখন বিরক্তও হইত, কিন্তু কিছুই বলিতনা।

পড়াশুনার শেষে দু-একদিন আমি তার ডেস্‌ক হইতে "ক্ষণিকা"খানি তুলিয়া নিতাম, এলোমেলোভাবে পড়িতে পড়িতে দু-একটিতে কখন্ মন নিবিষ্ট হইয়া পড়িত, খেয়াল থাকিত না। শ্যামল কুঞ্জবনতলে সঞ্চারমান গোপবালার গোপন অভিসার-যাত্রার মত দূর অতীতের পরম রহস্যময় মায়ার আবেষ্টনী সৃষ্টি হইত। শ্রাবণমেঘের ছায়ায় কালিন্দীর কালো জল আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া যাহারা গাগরী ভরণে আসিয়াছিল তাহাদের অন্তর শিহরিয়া উঠিল। চঞ্চল হস্তে কিঙ্কিণী ধ্বনিত হইল। খেয়াতরীখানি দুলিয়া উঠিয়াছে—আর কুঞ্জবন আলো করিয়া ময়ূর কলাপ বিস্তার করিয়াছে।

এই চিত্রের মোহময় স্নিগ্ধ সরস রূপের লহরীর মধ্যে অলক্ষ্যে কখন কলিকাতার প্রখর আলোকিত রাজপথ তলাইয়া যাইত, পড়িবার ঘরখানির অস্তিত্ব লোপ পাইত। সেখানেও যেন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছে, তরী বুঝি দুলিতেছে, ঐ বুঝি শ্যামবনবীথি মথিত করিয়া বর্ষার বাতাস ছুটিয়া আসিতেছে।

চাহিয়া দেখিতাম, জানালার নীল পর্দাটি উড়িতেছে, নমিতার মাথার চুল উড়িয়া মুখে পড়িতেছে, আর সে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

এই একটি মুহূর্ত সে যেন তাহার নিস্পৃহ অভিমান ছাড়িয়া আপন স্বরূপে দেখা দিত। আমার মনে হইত, গোপিনীরা কি ইহার অপেক্ষাও সুন্দর ছিল, নমিতা কি দ্বাপরে গোপবালা হইয়া কালিন্দীকূলে বর্ষার আবাহন করে নাই?

নিঃসন্দেহে বুঝিলাম—ভালোবাসিয়াছি। তাহাকে আমি কেন, যে কোন পুরুষ, যাহার প্রাণ আছে, চক্ষু আছে, অন্তর আছে—সে কখনই এই মমতাময় দৃশ্যটির মধ্যে তাহাকে দেখিয়া ভালো না বাসিয়া পারিত না। তাহার আটপৌরে শাড়ির মধ্যে অগোছাল নিখুঁত সৌন্দর্য এমন ঘরোয়া-ভাবে ধরা পড়িত, যেন তাহা মাজিয়া ঘসিয়া সাজাইয়া দেখিবার বাসনাও জাগিত না।

যাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না তাহাকে ভালোবাসিবার একটি সহজ ও সুলভ পরিস্থিতি জুটিয়া গিয়াছে। এই সৌরভময় মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণ মোহময় আকর্ষণে উচ্চকিত করিয়া রাখে। কত নগন্য তার ব্যক্তি—কিন্তু তাহারই মধ্যে অযুত সম্ভাবনার আশ্বাস ঝঙ্কার তুলিয়া ফিরিতে থাকে। জানি না কি বিশ্বাসে আমি যেন বিকশিত হইয়া উঠিতেছিলাম।

প্রাণের স্বভাবধর্মই এইরূপ আত্মানুভূতির রোমাঞ্চকর পরিব্যাপ্তি কিনা জানিনা, কিন্তু নমিতার দিক হইতে স্পষ্টত' কিছুই বুঝিতে পারি না। মনে হয় পরীক্ষার তাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথ না ডিঙ্গাইয়া সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, আমার নাগালও তাহার কাছে পৌছে না। ভাবিলাম পরীক্ষা শেষ হইলে এই ক্ষণিকার পাতায় পাতায় যে অবিনশ্বর রসধারা বিচিত্র লহরী তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে উহারই কূলে তাহাকে নিয়া দাঁড়াইব; সেই ক্ষণিকার ভাব-তরঙ্গিণী তীরে আমাদের ক্ষণিক মিলন চিরদিনের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু হইয়া উঠিল না, কিছুই হইল না।

নমিতাকে কথাটা যেদিন পাড়ি পাড়ি করিতেছি সেদিন পরীক্ষার ভারমুক্ত নমিতাও যেন অনেকটা উন্মুখ হইয়া আছে মনে হইল। কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেও সে সোজা করিয়া ধরিয়া বলিল, মাষ্টারের পক্ষে ছাত্রীকে ভালোবাসা খুবই সোজা, কি বলেন?

নমিতার নিম্ন কণ্ঠস্বরে এত বড় স্পষ্ট উক্তি প্রত্যাশা করি নাই, এ যেন কে বলবান হস্তে বৃষের শৃঙ্গদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছে। এক মুহূর্তে আমার ভিতরটা যেন রী রী করিয়া উঠিল। বলিলাম, কথাটা তুমি কি ভাবে গ্রহণ করো, নমিতা? কিন্তু তুমি কি জানো না, স্নেহ ভালোবাসা সহজ জিনিষ। সহজ অর্থ যা সঙ্গে সঙ্গে জন্মে। কাউকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভালো লাগে, ভালো বাসে—সেটা কি অহেতুক, সহজ বলেই সত্য নয়?

মাথা নিচু করিয়া নমিতা বসিয়াছিল—সেই ভাবেই সে একটু হাসিল, বলিল—সহজ বলেই সেটা সুলভ। দুর্লভ করে যাকে না পেলেন, অনায়াসে পাওয়ার গ্লানি তাকে গ্রাস করে ফেলে।

তর্ক করিয়া কাহারও উপর ভক্তি আনা সম্ভব নয়, তর্ক করিয়া কাহাকে ভালোবাসাও যায় না, ভালোবাসানোও যায় না—এটুকু বুঝিতাম, তাই বৃথা তর্ক না করিয়া উঠিয়া আসিলাম। সেদিন সন্ধান নিয়া জানিতে পারিলাম—কেন এবং কিসের বলে নমিতা গম্ভীর স্বরে কথাগুলি আমাকে শুনাইয়া দিয়াছে। যে বন্ধু ছাত্রীটির সন্ধান দিয়াছিল, সে-ই জানাইয়া দিল, নমিতা অন্যত্র আসক্ত এবং সে জন্যই সে প্রাণ পণ করিয়াছে। প্রতিটি দিন সে তাই মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আপনাকে প্রিয়তমের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

মহৎ প্রেমের প্রেরণা লইয়া ফিরিয়াছিলাম। নমিতার কাছে আর মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। সে আমাকে কতদূর নীচমনা বলিয়া মনে করিয়াছে।

পৃথিবীর বর্ণ বদলাইয়া গেল; বুঝিলাম সংসারে অর্থ-সামর্থ্যই মূল বস্তু। নারীর প্রেম স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতিও সেই অর্থের বেদীমূলে নিত্য উৎসর্গিত হয়। নতুবা দরিদ্র বলিয়া, বেকার বলিয়া আমার কি প্রাণ নাই, না সে প্রাণে সত্যকার স্নেহ মমতা থাকিতে পারে না। না, শুধু নমিতার জন্য নয়, বিশ্ব সংসারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আমার মনের মধ্যে আক্রোশে ফুঁসিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কলিকাতার একটা অজ্ঞাত গলির মধ্য দিয়া একদিন বাহির হইতেছি, রসা রোডে ট্রাম ধরিব। গলিটা একটা মোড় ঘুরিয়া সোজা যাইয়া রসা রোডে পড়িয়াছে ভাবিয়া সেই দিকে হাঁটিলাম। বৃষ্টি আসিতেছে—সুতরাং ব্যস্ত।

মোড়টার কাছেই একটি জানালায় অকস্মাৎ একটু নজর পড়িয়া মনে মনে হাসিলাম—সেই একই দৃশ্য, একই কাহিনী রচিত হইতেছে। একটি টেবিলের পাশে একজন যুবক বসিয়া কি পড়িতেছে, আর নিকটে দাঁড়াইয়া—তাহার ছাত্রীই হইবে, ছাত্রী না হইয়া যায় না।

একটু দূর চলিয়া আসিয়া মনে হইল, ছাত্রীটিকে যেন চিনি, যেন নমিতা। ফিরিতে হইল। নমিতা থাকিত শ্যামবাজারে, এটা যে রসা রোড্। কে টানিয়া আনিল জানি না, স্বাভাবিক গতিতে সাধারণ পথিকের মত ফিরিলাম ও ধীরে ধীরে জানালা অতিক্রম করিলাম। এবার আর সন্দেহ রহিল না, নমিতাই, তবে সিন্দূরের আভায় তাহার গৌর মুখশ্রী যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আবার ফিরিয়া বড় রাস্তায় উদ্দেশেই চলিলাম। নমিতার তবে বিবাহ হইয়াছে। কবে হইল, কাহার সহিত হইল কে জানে? জানিয়া আমার লাভই বা কি?

অকস্মাৎ চাপিয়া জল আসিল। আমি জোরে চলিয়া যে বারান্দাটির তলায় আশ্রয় নিলাম তাহারই নিকটে গলির মোড় ঘেসিয়া জানালাটি,

দাঁড়াইয়া দেখা গেল, চেয়ারের যুবকটি একখানি বই-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বর্ষার ক্ষীণ আলোকে তাহার পুরু কাচের চশমাতেও বোধহয় সে দেখিতে পাইতেছেনা। আর তাহার চেয়ার ঘেঁসিয়া নমিতা ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন তাহার অবিন্যস্ত কেশপাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শুনিলাম যুবকটি পড়িতেছে—

ওরে শাওন মেঘের ছায়া নামে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীর কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি খুলে॥

সেই কবিতা, যাহা একদা আমাকে অযুত স্বপ্ন দেখাইয়াছিল, যে কালিন্দীর কূলে আমি নমিতাকে স্বরূপে চিনিবার অপার গৌরবে উল্লসিত হইয়া উঠিতাম।

শ্রাবণের বৃষ্টি সজোরে তর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল, যেন কাহার উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধের জিঘাংসার রূপ সে জলধারার প্রমত্ত তাণ্ডবে প্রকট করিয়া তুলিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, পথের ছিট্‌কানো কাদাজলে কাপড়ের কৌলীন্য নষ্ট হইতেছে। একটু ঝুঁকিয়া পড়িলে রসা রোডে ছুটিয়া-চলা ট্রাম-বাস দেখা যায়, কিন্তু এতটা পথ দৌড়িয়া গেলেও ভিজিয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে সদ্য-আদায়-করা একখানি সার্টিফিকেট ছিল, সেটির উপর মায়া জীবনের অপেক্ষাও অধিক—কারণ ঐ সার্টিফিকেট হয়ত আমার উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিবে। অতএব নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।

বাহিরে বর্ষার প্রমত্ত মূর্তির উচ্ছল আলাপের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের মধ্যে বর্ষার কাব্য জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার খণ্ড অংশ শুনা যায়—

আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে।

এ পথে সত্যই লোক চলিতেছে না, রাজপথেই শুধু ট্রাম-বাসগুলি যন্ত্রযুগের জয় ঘোষণা করিতেছে। একটি গানের কলি আমার মনে পড়িল—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।"

কিন্তু না, দুর্বলতা আর পোষণ করিনা। এখন 'ঘনঘোর বরিষায়' চিন্তা করি, রেন-কোটের বিজ্‌নেস্‌টা এবার জোর চলিবে, কিন্তু মূলধন কৈ, নতুবা কি আর চাকুরি চাকুরি করিয়া ঘুরি?

বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, মনটা যখন নিজের কানে আসিল তখন শুনিলাম—

"—ওরে আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, সত্যিই এমন দিনে কি ঘরের বাইরে যেতে দিতে আছে মানুষকে। তুমি তো তবু বড়বাজারে ছুটেছিলে, জোর করে ধরে না রাখলে এমন বৃষ্টিটা মাটি হত।

নমিতার স্বামী উত্তর করিলেন—সত্যি কি ঘরের বাইরে না বেরুলে চলে। দেখ না, ঐ বারান্দায় এক ভদ্রলোক কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে।

কথাগুলি যে আমি শুনিতে পাইতেছি তাহা নিশ্চয় উহারা অনুমান করেন নাই। বারান্দায় আমিই আছি, আর একটি গরু ভিজিতে ভিজিতে কিছুক্ষণ আগে আসিয়া উঠিয়াছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে নিশ্চয় আমাকেই একটু ভদ্রলোকের মত দেখায়; অন্তত জামাকাপড়টা সন্ত ধোপ ভাঙ্গা, সার্টিফিকেট আদায় করিতে আসিয়াছিলাম, সুতরাং স্মার্ট সাজিতে হইয়াছে। এবার আমাকে উদ্দেশ করিয়া উহারা কথা বলিতে সুরু করিয়াছে

দেখিয়া এ বারান্দায় আর দাঁড়ান সঙ্গত মনে হইল না। ট্রামের উদ্দেশেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া পথে নামিলাম। পিছনে দরজা খুলিবার শব্দ যেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া তাকাইতে ভরসা হইল না। আমার ভরসা না হইলেও যিনি দরজা খুলিয়াছেন তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে ডাকিলেন—সন্তোষবাবু!

নিজের নাম ধরিয়া আহূত হইলে নিজেব অজ্ঞাতেও অন্তত একবার সকলেই ফিরিয়া তাকায়। আমিও তাকাইতেই দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। নমিতা নিজে আসিয়াছে, বারান্দায় নামিয়া ডাকিতেছে—এই জোর বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন, উঠে আসুন, উঠে আসুন।

উঠিতে হইল, কথাটা অবহেলা করিলে যেন অপমান করা হয় মনে হইল। নমিতা বলিল, এখানে আসুন, ভিতরে আসুন—বলিয়া সে আমায় পথ দেখাইয়া ভিতরে নিয়া গেল।

ভিতরটা বাহির অপেক্ষা অন্ধকার, বর্ষার জন্যও বটে, ঘরের ছাদটা নীচু বলিয়াও বটে। নমিতা আলো জ্বালাইয়া আমাকে বসিতে দিল। পাশেই তাহার স্বামীকেও দেখিলাম। নমিতা আমাকে দেখাইয়া তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—ওঁর কথা বলছিলে, ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন? এঁর নাম সন্তোষবাবু, খুব ভালো কবিতা লেখেন, আর রিসার্চ করেন।

নমিতার স্বামী বলিলেন—শুনে আনন্দিত হলাম, নমস্কার।

তাহার প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে আমিও প্রীত হইলাম, বলিলাম, আপনি নিশ্চয় আমাকে দেখেন নি আগে, নমিতা দেবীর প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় আমি তার গৃহশিক্ষক ছিলাম, কিন্তু আমার যে পরিচয় তিনি দিলেন সেটা নেহাৎ বাগাড়ম্বর।

নমিতার স্বামী বলিলেন—এইমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া হচ্ছিল, তাই আপনি যা আপনার অপ্রধান গুণ মনে করেন সেটাই নমিতার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এ কথার আমি কোনও জবাব দিলাম না। নমিতা ভিতরে গিয়াছিল। আমি একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া নিলাম। কি দেখিলাম তাহার সবটা বুঝিলাম না বলিয়া নমিতার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঐ গুলি কি?

ঘরের কোণে এক গাদা সাদা কাপড়ের মত পদার্থ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। তিনি উত্তরে বলিলেন—কালিঘাটের গেঞ্জির নাম শুনেছেন বোধ হয়, এও কালিঘাটের গেঞ্জির একটি কারখানা। আপনার ছাত্রীটি তার পরিচালিকা এবং আমাকে—এর ম্যানেজার থেকে বাজার সরকার, দালাল, মুটে—যাই বলুন সবই খাটবে। এই দেখুন না এইমাত্র বড়বাজারে যাব বলে বের হচ্ছি, আর চেপে বৃষ্টি এসে গেল।

নমিতা চায়ের বন্দোবস্তে গিয়াছে ভাবিলাম—ফিরিয়া আসিল রেকাবিতে মিষ্টি নিয়া, জলের গ্লাসটাও সে নিজেই আনিয়াছে; টেবিলে রেকাবিটা নামাইয়া বলিল—আপনি চা খান নাকি? আমাদের আবার ওসব বালাই নেই। বলেন তো না হয় রাস্তা থেকে আনিয়ে দিই।

চা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। তবে কিনা নানা জনের দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, একজন আগাইয়া দিলেই তো ঠেলিয়া রাখা যায় না, মনে ভাবিবে কি?

নমিতা হাসিমুখে বলিল—আপনি আমাদের এখানে আর কখনও আসেন নি; আমাদের এ সামান্য আতিথ্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না।

বলিলাম, কুণ্ঠা কিসের। আমি কি জানতাম যে বাসাটা এখানে? তাহাকে আপনি বলিব, কি তুমি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

মিষ্টি ক'টি গলাধঃকরণ করিয়া গ্লাসের জলটুকু তৃপ্তির সহিত পান করিলাম। সকালে উঠিয়াই ছুটিয়াছি, পাছে 'রায় সাহেব' বাহির হইয়া যান, তবে আর আজও সার্টিফিকেটটা পাওয়া যাইবে না। সার্টিফিকেট মিলিয়াছে, কিন্তু সকাল অবধি একটু কুটা দাঁতে না কাটায় উদরের অন্ত্রগুলির

মধ্যে দাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। নমিতার দেওয়া মিষ্টি ও জল সেই দাহ নিবাইয়া দিল।

তুমি ও আপনির দ্বন্দ্বে নমিতাকে ছাড়িয়া তাহার স্বামীকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দিন এ কারখানা করেছেন?—

বছর দুই হ'ল, কেমন নমিতা? ধরুন এপ্রিল টু মার্চ, এক বছর, আর—

বাধা দিয়া নমিতা বলিল—খুব তো হিসেবী লোক, এই তো সতের মাস চলেছে।

আমিও তো তাই বলছি, এপ্রিল টু মার্চ এক বছর, তারপর······

তাহার কথায় বাধা দিয়া নমিতা আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—দেখ্‌বেন?

একটি সুইচ বোর্ডের কাছে যাইয়া সে চার পাঁচটি সুইচ জ্বালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি চারটি ঘর ও বারান্দা আলোকিত হইয়া উঠিল। আমি ও নমিতার স্বামী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এটা সেটা দেখিলাম, নমিতা পরম আনন্দের সঙ্গে সকল জিনিষ দেখাইল। তারপর বলিল, ওর বরাবর ইচ্ছে ছিল কলেজের প্রফেসর হবেন। কিন্তু প্রফেসর হয়ে কি হ'ত বলুন তো? বড় জোর নিজে একটু সুখে সম্মানে থাকতেন, কিন্তু ভালোবেসে ছেলেদের যে শিক্ষা দিতেন তাতে তারা অকেজো হয়ে বেকারের সংখ্যাই বাড়তো না কি? এখানে তবু ওর দশটি প্রিয় ছাত্র অন্ন সংস্থান করতে পারছে। সেটা কি আনন্দের কথা নয়?

আমি বলিলাম—জ্ঞান চর্চা এক পৃথক জগতের কথা।

নমিতা বিনীতভাবেই বলিল—কিন্তু শুধু জ্ঞানের আলোচনায় একটা জাতির কিছুতেই চলে না, তার সমাজ বাঁচিয়ে রাখতে হলে বিবিধ রকম কাজ করা চাই, কাজ করলেই উপার্জন হয়, যাতে উদরের অন্ন, পরণের বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়।

দেখিলাম,—নমিতা কথা কহিতে শিখিয়াছে। মনে শান্তি পাইলে মানুষ

পৃথক জীবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। মনে হইল—যে অবস্থায় তাহাকে আমি পূর্বে দেখিয়াছি সে যেন তাহার মৌন তপস্যার যুগ। এই বুদ্ধি-প্রতিভায় দেদীপ্যমান বাক্‌পটু মহিয়সী মূর্তি সেই তপস্বিনীর অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে পারি নাই. আজ না দেখিলে বুঝিতাম না।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা কারখানা সে দেখাইয়া দিল। নীচে মাল প্রস্তুত হয, উপরে অফিস, তাহাদেব থাকিবার ঘব, ছাদে রান্নাঘর। সংসাবটা তাদের পক্ষে যেন কত সহজ হইয়া উঠিযাছে।

নমিতাব স্বামীকে আমার ভালো লাগিল। সুরসিক ও মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। ইহাকেই পাইবাব জন্য নমিতার কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছে। তাহাব এই সংসাব ও স্বামীব এই কর্মধারা নমিতা নিজে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও আড়ম্বর চোখে পড়িল না, অথচ সমস্ত পরিমণ্ডলটিতে একটি সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা সচরাচর কাবখানা বা গৃহস্থালিতে মিলে না।

বাহিরে বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধবিয়া গিয়াছে। আমি উঠিবাব কথা বলিলে নমিতার স্বামী একটি গেঞ্জি আমায উপহাব দিলেন। গেঞ্জিটি নিযা আসিয়াছি—আসল কালিঘাটের গেঞ্জি।

———

মা

মফস্বলের ছেলে মনোজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিতে কলিকাতা আসিয়া যেদিন প্রথম দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ যায় সেদিনের একটি ঘটনা তাহার মনে আছে। প্যারিচরণ সরকার সড়ক ধরিয়া স্যাণ্ডাল টানিতে টানিতে সে যাইতেছিল, উত্তর দিকের গেট দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় করুণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—এ বাবা, এ রাজা বাবা—

মনোজ বিরক্ত হইল, প্রবেশপথেই এমন বাধা, পিছুডাক বলাও যায়। তাকাইয়া দেখিল, গেটের বড় থামের গা ঘেসিয়া বসিয়া আছে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা। তাহার শতছিন্ন মলিন বসন হইতে স্বরু করিয়া পক্ক কেশ ও লোলচর্ম সব কিছুই সে এক নজরে দেখিয়া লইল। বৃদ্ধার হাতে একটি ফুটা এনামেলের বাটি, হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, তবু হাত তুলিয়া সে মনোজের দিকে প্রসারিত করিয়া করুণ কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিল—'রাজা বাবা, একটা পয়সা দে বাবা।'

পকেট হইতে একটা দু-আনি তুলিয়া সে বৃদ্ধাকে দিয়া চলিয়া গেল।

কয়েকদিন সে পথে আর আসা হয় নাই, মনোজের মনেও ছিল না বৃদ্ধার কথা। আবার যেদিন ওই পথে আসিল, সেই এক স্বর—এ বাবা, রাজা বাবা! মনোজ সেদিনও কিছু দিয়া গেল।

এই ভাবে ক্লাসে ঢুকিতে, রেষ্টুরাণ্ট হইতে পথে বাহির হইতে যখনই সে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের উত্তর দ্বারে যাইত, দেখিত, বৃদ্ধা বসিয়া আছে। এমনি চুপচাপ থাকে, যখন কোন লোক নিকট দিয়া যায়, তখনই স্বর তোলে—এ বাবা, রাজা বাবা—

সম্বন্ধটা কখন যে গভীর হইয়া উঠিয়াছে, মনোজ তাহা জানিতেও পারে

নাই। ক্রমে কেবল পয়সা দিয়াই সে ক্ষান্ত হইতে পারিল না, বুড়ী কোথায় থাকে, তাহার কে আছে, কি ভাবে চলে প্রভৃতি সব কথা সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিল। নিকটস্থ একটি কুখ্যাত বস্তিতেই সে থাকে এবং তাহার 'মরদ' কোন তেলকলে কুলীর কাজ করিত। কতকাল আগে—দুই কুড়ি বৎসর হইবে, বা তাহারও বেশি, বৃদ্ধা তাহার সঠিক খবর জানে না,—তাহারা মুজঃফরপুর জেলা হইতে আসিয়াছিল, আর ফেরে নাই। বৃদ্ধ বয়সে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম বৃদ্ধা বলিত তাহার পুত্র সন্তান নাই, কিন্তু মনোজের সহিত আলাপ ক্রমে গভীর হইলে সে জানিতে পারিল, বৃদ্ধার পুত্র আছে কিন্তু সে মায়ের কোন খোঁজ নেয় না।

'এ বুড্ডী মায়ী'—হাসি মুখে মনোজ বৃদ্ধার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কুশল প্রশ্ন করে। বৃদ্ধা এখন আর ভিক্ষা চাহে না, হিন্দি বাংলা মিশাইয়া মনোজের সঙ্গে গল্প করে। যাইবার সময় মনোজ যেদিন যাহা পারে বৃদ্ধাকে দিয়া যায়।

একদিন বৃদ্ধা মনোজকে বলিল: তোমার ব্যবহার করা একখানা ছেঁড়া কাপড় যদি পাই একটু পরে বাঁচি।

কাপড় শুধু দুর্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্য—ইচ্ছা করিলেই কিনিতে পাওয়া যায় না, তবু মনোজ নিজের একখানা ধুতি বৃদ্ধাকে পরদিন আনিয়া দিল। কাপড় পাইয়া বৃদ্ধা মহা খুশি, পারিলে সে মনোজের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিত। তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইতে লাগিল।

মনোজের বাড়ী হইতে তাহার মা কিছু নারিকেলের 'গঙ্গাজল সন্দেশ' পাঠাইয়াছিলেন, মনোজ একটি ঠোঙ্গায় তাহার কিছু নিয়া বৃদ্ধাকে দিতে আসিয়াছিল। আহা, বয়স হইয়াছে, আর ক'দিনই বা বাঁচিবে, একটু ভালোমন্দ যে খাইবে সে ভাগ্য নিয়া আসে নাই, নতুবা এ বয়সে কি স্বামী মরে, পুত্র ঘর ছাড়িয়া যায়!

কিন্তু বৃদ্ধাকে সেদিন গেটের কাছে পাইল না। বোধহয় আজ প্রথম সে অনুপস্থিত হইল। মনোজ কতদিন আসিতে পারে নাই। কতদিন ইচ্ছা করিয়াও আসে নাই, কিন্তু যত দিন আসিয়াছে, দেখিয়াছে ওই বড় থামটি হেলান দিয়া বৃদ্ধা বসিয়া আছে। যেদিন বেশী বৃষ্টি হইয়াছে সেদিন থামের কাছে বসিতে পারে নাই, অপর ফুটে হেয়ার ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের কয়েকটি ছায়াতরুর পত্রাচ্ছাদন যেখানে ফুটপাথের অনেকখানি যায়গা ছাইয়া রাখিয়াছে, বৃদ্ধা সেখানে যাইয়া বসিত, মনোজ খুঁজিয়া নিত। আজ কিন্তু সেখানেও তাহাকে দেখা গেল না। মায়ের হাতে তৈয়ারী গঙ্গাজল সন্দেশের ঠোঙাটা পকেটে পড়িয়া রহিল।

পরদিন মনোজ আবার গেল, যাইয়া দেখে বৃদ্ধা যথারীতি থাম হেলান দিয়া বসিয়া আছে। পরণে সেই জীর্ণ মলিন বসন। সেই ফুটা এনামেলের বাটিটি হাতের কাছে, কে একটা ফুটা পয়সা ফেলিয়া গিয়াছে।

মনোজ যাইয়া ডাকিল—'এ বুড্ডী মায়ী'।

বৃদ্ধা অন্য দিনের মতো—'এ রাজা বাবা' বলিয়া সাড়া দিল না, কেবল চক্ষু তুলিয়া চাহিল।

মনোজ বলিল—তোমার সে কাপড়া কি হইল মায়ী?'

বৃদ্ধা ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তারপর শিশুর মত হাউমাউ করিয়া যাহা বলিল, মনোজ তাহার একটি কথাও বুঝিতে পারিল না। বয়স বেশি হইলে মানুষ আবার শিশু হইয়া যায় একথার মধ্যে বোধ হয় সত্য আছে।

বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া শেষ পর্যন্ত যাহা মনোজ জানিতে পারিল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। বৃদ্ধার সেই গৃহত্যাগী পুত্র মায়ের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রখানি কাড়িয়া লইয়াছে। যুবক পুত্রের হাতে বৃদ্ধা জননীর যে লাঞ্ছনা হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু চিহ্ন বৃদ্ধার কপালে, বাহুতে দেখিতে পাওয়া গেল।

শুধু কি কাপড়? ভিক্ষালব্ধ অর্থও নির্মম ভাবে সে কতদিন কাড়িয়া নিয়া যায়। পুত্রের বিরুদ্ধে সকল কথা বৃদ্ধা এতদিন খুলিয়া বলে নাই, আজ ক্ষোভে দুঃখে অনেক কথাই বলিল। বলিল, তাহার স্বভাব ভালো নয়, কোন নির্দিষ্ট বৃত্তিও নাই, তাই জুয়াচুরি গুণ্ডামিকে পেশা করিয়া নিয়াছে। প্রায়ই ঘরে ফিরে না, ফিরিলেও কমদিনই প্রকৃতিস্থ থাকে। মায়ের ভিক্ষালব্ধ পয়সায় নেশা করিতেও তাহার লজ্জা নাই।

'পাষণ্ড'—! মনোজ মনে মনে তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। শেষে বলিল, তোমার ছেলেকে আনতে পারো আমার কাছে ডেকে, আমি বলে বুঝিয়ে দেখতে পারি!'

বৃদ্ধা অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিল,—'না, সে চেষ্টায় ফল হবে না বাবা, সে গোঁয়ার, সে ডাকাত, হয়ত তোমারই কোন ক্ষতি করে বসবে!

কিন্তু না ডাকিতেই একদিন সে আসিল। সেদিন মনোজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের রেষ্টুরাণ্ট হইতে চা খাইয়া বাহির হইয়াছে এমন সময় গেটের বাহিরে কি বচসা শুনিয়া আগাইয়া দেখিল, তাহার বুড্ডী মায়ী একজন জোয়ান পুরুষের সহিত কি নিয়া কথা কাটাকাটি করিতেছে। মনোজ আগাইয়া আসিবার পূর্বেই সে বৃদ্ধার কোমর হইতে একটি ছোট পুঁটলি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত! মনোজ ছুটিয়া আসিয়া লোকটির হাত চাপিয়া ধরিল। এবার প্রবলের সঙ্গে প্রবলের বিরোধ, তাই হাত সহজে ছাড়ানো গেল না, কিন্তু অন্য হাতে কোমর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির হইয়া আসিল।

বৃদ্ধা ততক্ষণে বকিতে সুরু করিয়াছে। মনোজ বুঝিতে পারিল, আজও তাহার পুত্র ভিক্ষালব্ধ অর্থ কাড়িয়া নিতে আসিয়াছিল—একটা অপ্রত্যাশিত বাধায় নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছে। বেশীক্ষণ ভাবিবার পূর্বেই সূর্যালোকে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ঝলসিয়া উঠিল কিন্তু মুহূর্তের তৎপরতায় মনোজ

নিজেকে রক্ষা করিয়া আততায়ীকে জুজুৎসুর কৌশলে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণে ছোরাখানি নিজের হাতে কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিল।

বৃদ্ধা কাঁপিতেছিল, আততায়ী ধরাশায়ী হইয়াছে দেখিয়াও তাহার কাঁপুনি কমিল না। পরন্তু মনোজ আততায়ীর উপর চড়াও হইয়া ছোরা কাড়িয়া নিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল, মনোজ প্রতিশোধ নিতে চাহিতেছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য সে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রক্ত! বৃদ্ধার লোলচর্ম বাহিয়া খানিকটা রক্ত গড়াইয়া তাহার মলিন বসন স্পর্শ করিল, তাহার পর কঠিন রাজপথের শিলাতলে আসিয়া থিতাইয়া পড়িতে লাগিল। আততায়ীর হাত হইতে সজোরে কাড়িয়া আনিবার সময় ছোরাখানা বৃদ্ধার বুকে যাইয়া বসিয়াছে।

পারিবারিক

অনিচ্ছাক্রমেই রাজী হইলাম। নিতাই বাড়ি যাইবে, মেসের মধ্যে তাহার মতে আমিই সকল দিক দিয়া তাহার নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া সে আমাকেই ধরিয়াছে। যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে যদি মাস্টারের ব্যবস্থা না করিয়া যায় তবে হয়তো তাহার এতদিনের ভালো টুইশানটা হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। সুতরাং রাজী না হইয়া পারিলাম না।

বিবেকানন্দ রোডের উপর প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ি। সোজা সিঁড়ি বাহিয়া চারতলায় উঠিয়া সি সি সোমের ঘরে ঢুকিলাম। ছাত্রছাত্রী পড়িবার জন্য

প্রস্তুত ছিল, নিজেকে পরিচিত করিতে কষ্ট পাইতে হইল না। ছাত্রটি ক্লাস ফোরের আর ছাত্রীটি টু-এর। সুতরাং পড়াইতে বেশী সময় লাগিল না, বেগও পাইতে হইল না, বাহিরে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

টুইশান আমার সহ্য হয় না। সারা মাস ধরিয়া গ্রামার, ট্রানশ্লেশন অঙ্ক, ইংরাজী বিবিধ শাস্ত্র আওড়াইয়া মাসান্তে হাত পাতিলে যখন কর্তৃপক্ষ বলিবেন, 'চাকর বামুন ঝি' মাষ্টার সবাইয়ের দশ তারিখে আমরা মাইনে চুকাই, তখনকার অবস্থাটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দশ তারিখেও পুরা দশটি টাকা একত্রে সব যায়গায় মিলেনা। সামান্য উপার্জ্জনে কষ্টে দিন কাটাইতেছি সত্য কিন্তু সে কষ্ট ওই কষ্টের মত নয়। জানি না নিতাই-এর সঙ্গে ওবাড়ির লোকেরা কেমন ব্যবহার করে। পৃথিবীর সকলেই অবশ্য খারাপ লোক নয়, তবে আর পৃথিবী চলিত না, আর তা ছাড়া নিতাই তো শীঘ্র আসিবে। এই দুই-তিন দিনের জন্য চোখ কান বুজিয়া একটু না হয় সহ্যই করিলাম। সত্যই তো আর আমি হাত পাতিয়া মাহিনা লইতে যাইতেছি না!

পরের দিনও গেলাম। নির্দিষ্ট সময়ের একটু পরেই গেলাম। সন্তুদের ঘরখানি আমার ভাল লাগে নাই। পাশাপাশি দু'খানি ঘর, একটুকরা বারান্দা, একখানি রান্নার খুপরি আর একটি বাথ রুম লইয়া সন্তুদের সংসার। ভাড়া বাড়ি, চারতলায় থাকা। মৃত্তিকাসংস্পর্শশূন্য। উপরেও একটি পরিবার থাকে, নিচেও একটি পরিবার থাকে, এপাশে ওপাশেও থাকে। এমনভাবে জীবনযাপনের সার্থকতা কি? ঘড়ি যেমন হাতে বাঁধ, পকেটে রাখ বা খোলা জানালার সামনে ঝুলাইয়া রাখ সে ঠিক সমানভাবে চলিবে, মানুষও কি তেমনি যেমনভাবে হউক একটু নিশ্বাস ফেলিতে পারিলেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে? যেখানে হউক বসিয়া দু'টি ক্ষুধার অন্ন মুখে তুলিয়া শ্রান্ত দেহ নিদ্রায় এলাইয়া দিতে পারিলেই কি সেই আশ্রয়স্থল সে যথেষ্ট মনে করে?

এই সবই ভাবিতে ভাবিতে কাল ফিরিয়া গিয়াছিলাম। আমার মেসের জানালার পাশে একটি কাঁঠাল গাছে কচি পাতা ধরিয়াছে। সেখান হইতে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। পূর্ণিমার চাঁদ উঠিলে তার অলোছায়ার আলিপনায় আমার বিছানা বিচিত্র হইয়া গেল। আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, না জানি কি নিদারুণ কষ্টে সন্তুরা ওখানে দিনাতিপাত করিতেছে। এই যে আকাশে আজ প্রচুর জ্যোৎস্না, ইহার এক কণাও উহাদের ঘর দুয়ার বারান্দায় প্রবেশের পথ পায় নাই, নীল আকাশের এতটুকুও স্নেহ-অঞ্জন ওই গৃহের অধিবাসিদের চক্ষু জুড়াইয়া দেয় না। তবুও মানুষ কোন্ সুখেই যে ঐ পঞ্চতল প্রাসাদে বাস করে!

আজ সন্তুদের ঘরে ঢুকিয়া মেঝেতে বিছানো কম্বলখানার উপরে বসিয়া পড়িলাম। সন্তু ঘরে ছিল না, রেবা একখানা শ্লেটে অঙ্ক কষিতে ছিল। টানিয়া দেখি অঙ্ক নয় একটা বিড়াল আঁকিবার চেষ্টা চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সন্তু কোথায়, আজ আমি ভারি ব্যস্ত।"

ব্যস্ততার বিশেষ কোনও কারণ ছিল না। কবুতরের খোপের মতো অপরিচিত এই ঘরে আমার মনে হয় বুঝি শ্বাসরোধ হইবে। কিন্তু ঘরগুলির আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, অধিকন্তু আধুনিক স্থাপত্য রীত্যনুযায়ী দরজা জানালা সবই বেশ পরিমিত রকম প্রশস্ত। এমন কি ছাদে একটা পাখা পর্যন্ত আছে। তবু মনটা যেন সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। মনে হয় জানালা খুলিলে একটা কাঁঠালের পাতা কেন অন্তত নজরে পড়ে না! এ যে 'ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ কীট!' মানুষ এখানে কীটেরই মত অগণিত ও নগন্য হইয়া গেছে। প্রসাদ বিরাট, অট্টালিকা সুন্দর ও সুষ্ঠু—কিন্তু মানুষ যেন তাহার মধ্যে কীটের সামিল হইয়া গেছে, তাহার স্বরূপ যেন ইট কাঠের আবেষ্টনে প্রচ্ছন্ন।

রেবাকে পড়াইতে লাগিলাম। সন্তু একটু পরে আসিল। রেবাকে তাহার ইংরেজী বই হইতে একটি গল্প পড়াইতেছিলাম। ছোট একটি

মেয়ে স্কুলে যাইবার সময় তাহার মায়ের নিকট বিদায় লইতেছে। মা তাহাকে বিদায় আশীর্বাদ জানাইয়া একটি স্নেহচুম্বন দিলেন। তারপর ফ্রক উড়াইয়া লিলি ছুটিল, তাহার হাতের বইয়ের বাক্সের মধ্যে পেনসিল কলম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে লাগিল। লিলি ছুটিতেছে আর তার মা দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন এই ছবিটি বইয়ে দেওয়া আছে। মা ও মেয়ের এ কাহিনী বলিতে বলিতে সন্তু আসিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

সন্তু বলিল, "জানেন মাষ্টার মশাই, মা আজ পিঠে করেছে, পিঠে! পিঠে করা দেখতে গেছলাম।"

রেবা বলিল, "জানেন মাষ্টারমশাই, দাদাটা এমন পেটুক! মা বল্লে, পড়া শেষ করে এসে খাবি, তা ও এরই মধ্যে দুবার উঠে গিয়ে খেয়ে এল। আপনি আসবার আগেও একবার গিয়েছিল।"

সন্তু প্রতিবাদ করিল "কখন?"

"গেলি নে তুই? মা আরও বকে দিলে!

"সে সময়ে বুঝি খেয়ে এলাম, তখন তো তৈরীই হয়নি। এবারও তো মোটে দুখানি। তোর জন্যেও আনতাম।"

আমাকে বিন্দুমাত্র সংকোচ না করিয়া ভাই ভগিনী কলহে মাতিল।

আজ আর ইহাদের পড়িবার মতলব নাই। পৌষ-পার্বন, পিঠা হইতেছে, সেই আনন্দে উভয়ে উন্মনা হইয়া আছে। উহাদের বকিতে ইচ্ছা হইল না। এমন দিন আমার জীবনেও গিয়াছে। বাড়িতে মা পিঠা করিতেন। চাউলের মিহি গুঁড়া ছাঁকিয়া যে মোটা গুড়া থাকে তাহা আমি আর দিদি দুর্বা বনে ছড়াইতাম আর দুর্বাগুলিকে পিঠা খাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়া আপ্যায়িত করিতাম। চাউলের গুঁড়ার গোলায় গেলাসের ছাপ মারিয়া উঠানে সূর্যকে পিঠা খাওয়াইতাম। কুমড়ার মাচা, ঢেঁকি, গরু সকলেই পিঠা খাওয়াইতে চাউলের গুঁড়ার গোলা ছড়াইতাম। সে

আনন্দ ইহারা পায় না। ইহারা শুধু খাইয়াই সুখী হইতে বাধ্য। নীরস রুক্ষতার মধ্যে নাই সে প্রাণআবাহন।

আর এখানে যেন চতুর্দিকের সোজা দেওয়াল ঘন হইয়া আকাশ ও বায়ুমণ্ডলীকে শতধা বিভক্ত ও ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে। এখানে গাছপালা নাই, দূর্বাদল নাই, উঁচু করা লোহার রেলিং আর কংক্রিটের ফুল। যেটা সাদা সেটা প্রাণহীন সাদা, যেটা কালো সেটা নিষ্ঠুর কালো। এ পাষাণপুরীই যেন প্রাণহীন। সত্যই, মানুষ যেন এখানে কীটেরই সামিল হইয়া আছে।

সন্তু রেবাকে বলিলাম, "তোমরা আজ আনন্দ করো, আজ পড়া থাক।

কিন্তু তাহারা রাজী হইল না। সন্তু বলিল, "আপনি এখুনি চলে যাবেন? মা-যে বলে পাঠিয়েছেন যদি কোন অসুবিধে না হয় তো এখানে একটু মিষ্টিটিষ্টি খেয়ে যেতে।"

সন্তুকে বুঝাইয়া বলিলাম, "তার কোনও দরকার নেই, আমি বরং এমনি বসছি।" পিঠার লোভ নয়, উহাদের সঙ্গ আজ কেন জানি ভাল লাগিতেছে।

রেবা বলিল, "গেল বার কি হয়েছিল জানেন স্যার? আমরা সেবার মামাবাড়ি ছিলাম না? তা সেখানে মামীমা চন্দ্রপুলি করে রেখেছেন আর দাদা একটা তুলে গালে দিতেই উঃ আঃ করে ফেলে দে ছুট।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?"

গরম, গরম ছিল বেজায় ভিতরটা। লোভী কি তা ঠিক পায়?

সন্তু চটিয়া গেল, বলিল, "মিথ্যে কথা স্যার, সব মিথ্যে কথা। আমাদের মামাবাড়ি কোথায় জানেন? খুলনায়। এই যে—বলিতে বলিতে সে একখানা ভূচিত্রাবলী খুলিল। তারপর খুলনায় যে গ্রামটায় তার মামাবাড়ি সেটা দেখাইয়া বলিল—এখান থেকে বঙ্গোপসাগর বেশী দূর নয়, না মাষ্টারমশাই? মামীমা কিন্তু কিচ্ছু জানে না, বলে কোথায় সাগর এখানে। ওই তো নদী কপোতাক্ষ!

ছোট দু'টি বালক বালিকার নিকট আমার সত্তা মুহূর্তের জন্ম হারাইয়া ফেলিলাম। তাহারা যে প্রচণ্ড আনন্দের তুফান তুলিয়াছে তাহার মধ্যে আমার বিচার-বিবেচনা ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারা ডুবিয়া গেল। মনে হইল না ইহারা দুর্বা কিংবা কুমড়ার ডগাকে পিঠা খাওয়াইতে না পারিয়া কিছুমাত্র কষ্টে আছে। ইহাদের আজিকার আনন্দের অনেকখানি আমাকেও পাইয়া বসিল।

এমন সময় বাহিরে চুড়ির শব্দ শুনিলাম। সন্তু রেবার সঙ্গে কলহে মাতিয়াছিল; আমি শব্দ শুনিয়া সন্তুকে বাহিরে পাঠাইব ভাবিতেছি, কিন্তু তাহার আর দরকার হইল না। মহিলা নিজেই পরিষ্কার কণ্ঠে সন্তুকে ডাকিলেন। একবার ভাবিলাম পড়াশুনা না করিবার জন্ম বোধহয় তিরস্কার করিবেন এবং আমার সামনেই যে তাহারা না পড়িয়া হুটোপুটি করিতেছে আর আমি বসিয়া সেই দৃশ্য অবলোকন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমার যে কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে সেই বোধ আমার মনকে পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু সন্তুর মা সন্তুকে বকিলেন না। কি জিজ্ঞাসা করিলেন শুনিলাম না, তাহার উত্তরে সন্তুর কথা শুনিতে পাইলাম—মাস্টারমশাই খাবেন বলেছেন। যেমনভাবে সে উত্তর দিল তাহাতে আমি বাধা দিবার অবকাশ পাইলাম না। তাহার মা চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে সন্তুর বাবা আসিয়া পড়িলেন। আজ একটু বিশেষ ব্যাপার, তাই সকাল সকাল। পূর্বে আমি ইহাকে দেখি নাই; নিতাই-এর কাছে শুনিয়াছিলাম তিনি ব্যবসায়ী, সুতরাং সকল দিন তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, ইনিই তবে মিস্টার সি সি সোম। চণ্ডীচরণ নামটা শুনিয়া পিত্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল। কতই বা বয়স, এই চল্লিশের কাছাকাছি। প্রশান্ত মূর্তি, স্বচ্ছন্দে আমার সহিত আলাপ করিলেন। ভাষায় তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাইলাম। ব্যবসায়ীর প্রতি অন্তরে যে একটি বিরাগের ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইল।

চণ্ডীচরণ আসিলে আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম, রেবা ও সন্তু উঠিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে সন্তু ডাকিতে আসিল।

আমাকেও যাইতে হইল। ঘর হইতে বাহির হইলে একফালি ছোট বারান্দা, টুকিটাকি জিনিস সাজানো, লম্বায় বার চৌদ্দ হাত হইবে। পাশের ঘরে দুয়ারের সামনে পাপোষ, মেঝেতে আসন পাতা একখানি। সামনে পরিচ্ছন্ন পাত্রে খাবার ও গ্লাসে জল। ঘরে যেন স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছে। চণ্ডীচরণ বলিলেন, "আসুন, রাত হয়ে গেছে।"

বলিলাম, "আপনার ?"

উত্তর দিলেন, "এই বাজার থেকে ফিরছি, এখনও পাইখানায় যাওয়া, হাত মুখ ধোওয়া বাকী। তারপর গৃহস্থ লোক, একটু সন্ধ্যা আহ্নিক আছে। আমার দেরি হবে, আপনি বসুন।"

জুতা খুলিয়া ঘরে গেলাম। সযত্নে মোছা মেঝের লাল সিমেণ্ট তক্ তক্ করিতেছে। ঘরে তিনটি জানালা। দুপাশে দুইখানি খাট। একটি ছোট ড্রেসিং টেবিল, একখানি বইপত্রের টেবিল ও চেয়ার। দেওয়াল ঘেসিয়া একখানি বেঞ্চের উপর কয়েকটি বাক্স সুটকেশ রাখা, কোণে একটি লোহার আলমারি। বেঞ্চের নিচে রেবার পুতুলের সরঞ্জাম আর সন্তুর ঘুড়ি ও লাটাই। খাইতে বসিয়া একটু একটু করিয়া সবই নজরে পড়িল।

এ কথা, সে কথা দুই চারটি বিষয় আলোচনা চলিতে লাগিল চণ্ডী-চরণের সঙ্গে। জানিলাম আমার সম্বন্ধে অযথা অনেক বিষয় নিতাই এখানে বলিয়া গিয়াছে। বন্ধুর খাতিরে পড়াইতে গিয়াছি বলিয়া তাহারা যেন কত কৃতজ্ঞ—এ যুগেও কি এমন পরার্থপর লোক থাকে ?

চাই না চাই না করিলেও রেবার হাতে তার মা আরও পিঠা-পুলি পাঠাইলেন। খাওয়া শেষ করিয়া মসলা লইয়া যখন বাহির হইলাম তখন রাত এগারটা।

পথে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিলাম, মন্দ নয়, আমাদের দাস্যবৃত্তি ও

মেসজীবনের অপেক্ষা ইহারা মন্দ আছে কি? এই কি মানুষ-কীট? কীটত্বতো ধরিতে পারিলাম না।

কিছুই বিশেষত্ব নাই, সাধারণ বাঙালি জীবন। অনেকেই ঘরের জানালায় পরদা দেয়, মেঝে সকলেই মুছে; তাহাতে অপরূপত্ব কি আছে? ইত্যাকার বিচারে যতই এই স্বল্পপরিচিত পরিবারটিকে মনে মনে উড়াইয়া দিতে চাহিলাম ততই যেন মনে হইতে লাগিল—উহারা বেশ আছে, বেশ আছে। উহাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যান নাই, মৃত্তিকার কোনও সংস্পর্শ নাই, বর্ধিষ্ণু সজীব কোন উদ্ভিদ প্রতিবেশী নাই। কিন্তু কঠিন, নীরব ও প্রাণহীন ইটকাঠ পাথরের মধ্যে যে দুটি শিশু আজ পার্বনের পিঠা লইয়া মাতামাতি করিল উহারা কি প্রাণরসে পুষ্ট নয়? সমস্ত দিন ব্যবসায়ের জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া গৃহে ফিরিয়া ওই চণ্ডীচরণ যখন দেখেন, গৃহলক্ষ্মী সযত্নে সকল কিছু পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছেন তখন কি তাহার মনে বনবাস করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে? যখন বালক বালিকা দুটি অকাতরে নিদ্রা যায়, স্বামী স্ত্রী কি তাহাদের মুখের দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা করেন না? তবে ইহারা কোন অংশে কীটের সমান, কৃপার পাত্র?

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া স্টোভে জল চাপাইয়া পাইখানায় গিয়াছি, আসিয়া দেখি স্টোভ নিবুনিবু করিতেছে। স্টোভ পরিষ্কার করিয়া, পাম্প করিয়া আবার জল বসাইয়া দাঁতন লইয়া বসিলাম। বিছানাটা এখনও তোলা হয় নাই; ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নাই; নিতাই-এর খাটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম বিছানাটা যেমনকার তেমন ভাঁজ করা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া ভাল লাগিল, নিতাই ফিরে নাই; আজও সন্তুদের পড়াইতে যাইতে পাইব।

—:০:—

খোকা

বাঁশীরাম নৌকাখানা বাঁশতলায় বাঁধিয়া রাখিয়া জল ঝপ্ ঝপ্ করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়া হাঁক দিল—'মা গো।'

মা ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল—পা-ধুয়ে ওঠ্। পরক্ষণে দাসের মেয়ের ডাক পড়িল এবং বাঁশীরামের ভাত বাড়িতে আদেশ হইল।

বাঁশীরাম খাইতে বসিলে মা কাছে আসিয়া বসিল—বলিল—স্বরোর বাড়ির সব আছে-টাছে ক্যামন? কি দেহে আলি ক'। জলের দাড়া বুঝিস ক্যামন?

মায়ের কোলে বাঁশীর দামাল ছেলে মাতলামো করিতেছে। দাসের মেয়ে হেঁসেলের কাছে মাথায় কাপড় তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ছেলেটি তার মায়ের কোলে যাইতে চাহিতেছে, মায়েরও অনিচ্ছা নাই—কিন্তু শাশুড়ী না ডাকিলে যাইয়া আনিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তাই দাঁড়াইয়া থাকিয়া বারে বারে সতৃষ্ণ নয়নে খোকার দিকে তাকাইতেছিল। বাঁশী বন্যার বিষয় কি বলিতেছে সেদিকে তাহার কিছুমাত্র কান নাই—খোকা যে হাম্ মাম্ গাম্ করিতেছে সেই দিকেই তাহার লক্ষ্য।

খোকার কিন্তু মাতৃসমীপে গমনের সদিচ্ছা প্রবল নয়। ঠাকুরমা যখন অপারগ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল তখন সে নির্বিবাদে যাইয়া লবণের পাত্রটা অধিকার করিয়া বসিল এবং সকলের অলক্ষ্যে মুঠা মুঠা সাদা লবণ কালো মেঝেয় ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। খোকার মা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। শাশুড়ী দেখিলে এক ঘর ঝগড়া হইবে। এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে অতটা লবণ অপচয় কাহারই বা সহ্য হয়। দাসের মেয়ে ঝটিতে খোকার হাত হইতে লবণের পাত্রটা কাড়িয়া লইয়া যতটা পারিল ছড়াইয়া ফেলা লবণ কুড়াইয়া লইল। খোকা বাধা জন্মাইলে তাহাকে একখানা নারিকেল

দিয়া ভুলাইল—তারপর তাহাকে হেঁসেলে আনিয়া নিম্ন স্বরে তিরস্কার করিল—অতখানি লবণ ফেল্লি, বজ্জাত—

খোকা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার তাহার সেই অস্ফুট বাণী হাম্ মাম্ গাম্। আবার তাহার মনে কি দুষ্টামি জাগিয়াছে।

আঁচাইয়া ঘটি রাখিতে বাঁশী একবার হেঁসেলের কাছে আসিয়া দেখে মায়েপুতে কি সব গল্প চলিতেছে। দাসের মেয়ে খুব হাসিতেছে আর খোকা পরম বিজ্ঞের মত গম্ গম্ করিয়া দুর্বোধ্য ভাষায় কত কি বকিয়া যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকে মুখে হাতে পায়ে নিজের হাত-পা ছুড়িতেছে।

বাঁশী আচমকা পিছন দিক হইতে আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া নিলে সে ঘোর আপত্তি জানাইল। পিতাকে তাহার প্রয়োজন নাই—এখন তার মাম্ মা-মা অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে প্রয়োজন আছে। বাঁশী হাসিয়া বলিল,—মাম্ মা-মা না হাতী। চল্ আমরা বাইরে যাই—মা এখন খাবে না?

দাসের মেয়ে হাসিয়া বলিল—খাবানে—অত ব্যস্ত কিসের। রওনা এট্টু, দেহো ওর কাণ্ডখানা, ঐ অতটুকু একরত্তি মাংসের দলা—ওর খ্যাওখান্ দেহো। অতহানি লবণ গোল্লায় গেলো—ওর ঠাম্মা দেখলি—

বাঁশী আদর করিয়া বলিল—ঠাম্মারে তো ওর মানতি মানতি কামাই নেই। বোলে ওর মা-ই মানে কত! বলিয়া সে দাসের মেয়ের দিকে চাহিল। সেও শেষের কথাটিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া বাঁশী হাসি থামাইতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে সে ছেলেকে লইয়া বাহিরে আসিল।

কিন্তু এ হাসি বেশী দিন আর রহিল না। জল বাঁশতলা ছাড়াইয়া উঠানকোণের চিকন পথটুকু বাহিয়া তার লোলজিহ্বা গৃহের দিকে প্রেরণ করিয়াছে। দিনের পর দিন জল উঁচু হইয়া উঠিতেছে। শশামাচার নীচে জল পৌছিয়াছে, মরিচের ক্ষেতটি যে ডাঙ্গা ভিটাটির উপর সেটিও ছোঁবো

ছোঁবো করিতেছে। গ্রামে, পার্শ্ববর্তী গ্রামে আত্মীয় স্বজনের গৃহে কোথাও এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়ের সম্ভাবনা নাই। খাল বিল পথ-ঘাট মাঠ সব জলে একাকার হইয়া গিয়াছে। উঠানে স্রোত বহিতেছে। দাওয়ায় বসিয়া বাঁশতলার ওপারে যে মাঠ দেখা যায় তার কোথাও এক গাছি সবুজ তৃণের চিহ্ন নাই—ঘোলাটে জল কোথা হইতে যে এত মত্ত গতিবেগ লইয়া আসিতেছে—বিধাতার স্পষ্ট অভিব্যক্ত অভিশাপ—দুর্বার, শাণিত, ক্ষুরধার।

মা বাঁশীকে ডাকিয়া বলিল—জলের ভাব কিছু ভাল দেহিনে রে। আমার বাপের জম্মে কোন দিন এমন জল দেহিনি। আমার ঠাকুরদার কাছে ছোট বেলায় গল্প শুনিছি যে, একবার এমন জল আইল। তাও ঘরের মধ্যি মানুষ ছিল। এবার যে বড় অসম্ভব দেখছিরে! আমাগো দেশে এমন জল কোন জম্মে কেউ দেহেনি—শোনেনি।

গোহাল ঘরটি কয়েকটি খুঁটির পায়ায় কোনক্রমে দাঁড়াইয়া আছে। ডোয়া অনেক দিন নাই—ঘরের ভিতর জল উঠিয়াছে। অবলা গরুটির কোথাও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। ছোট বাছুরটি বাঁশী শোবার ঘরের বারান্দায় আনিয়াছে। সেখানে রান্নার সরঞ্জাম আসিয়াছে। রান্নাঘরে জল উঠিয়া যাওয়া-আসার অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। উনুনে আগুন জ্বলে না।

জল দেখিয়া খোকার আনন্দ আর ধরে না। পরিষ্কার সে বুঝিতে পারিতেছে—পুকুর তাহাদের দুয়ারে আগাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরমা তাহাকে যখন ঘাটে স্নান করাইতে লইয়া যাইত—তখন কি আনন্দ! জলের উপর থাপড় দিয়া জল গুড়া গুড়া করিয়া চোখে-মুখে ছিটাইয়া দিতে কি অবর্ণনীয় আনন্দ এ অস্ফুটবাক্ শিশুর চিত্তে দোল দিয়া যাইত তাহা সে মনে করিয়া রাখিয়াছে। আর সেই জন্যই যখন ঐ দাওয়ার গায়ে স্রোতো-রেখা বাঁশীকে নিস্তব্ধ করিয়া জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছে, বাঁশীর মা'কে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে, আর দাসের মেয়ে ছেলের কথাও ভুলিয়া কখনও উদাস দৃষ্টিতে অদূরের সীমাহীন জলময় মাঠের দিকে

চাহিয়া থাকে, কখনও খোকাকে একান্তভাবে বুকে জড়াইয়া ধরে—তখন একমাত্র খোকাই সর্বান্তরে এই জলধারাকে আবাহন করে—আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। তাহার সঙ্গে আর একটি জীবন এই আনন্দে তার গলার ঘুঙ্গুর বাজাইয়া সাড়া দেয়—সে আমাদের বাঁশীর গরুর ছোট হুলে বাছুরটি।

জল উঠিল—আরও—আরও, অবশেষে কাঠের পৈঠাটি একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেল। ব্যবধান ঐ সল্প পরিসর বারান্দাখানি। একরাত্রে উহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তারপর—তারপর. ঘর, মেঝে, মাচা, চাল-মটকা এবং বাঁশী আর ভাবিতে পারে না। নিজের জীবনের উপর তাহার অত মায়া নাই। কিন্তু খোকা, মা, দাসের মেয়ে, কালো গাই, তার বাছুরটি যে তারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। উহাদের সে কোথায় আশ্রয় দিবে, কি মুখে তুলিতে দিবে? কিছু না খাইতে পাইলে গাই দুধ দিবে না।—খোকা কি খাইয়া বাচিবে? সে এখনও নির্বিকারভাবে গ-গ- করিয়া গঙ্গা আবাহন করিতেছে। অবোধ শিশু খেলার জলের ভয়াবহতা যে কিছুই ভাবিতে পারিতেছে না—অথচ কি কঠোরভাবেই না তাহাকেও ইহা সহ্য করিতে হইবে। যদি জল কমা পর্যন্ত থাকে—আর বাঁচে—তবে খোকার জীবনে এ একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়—অনন্য-সাধারণ শৈশব ইতিহাস। খোকাকে সে ভদ্রলোকের ছেলের মত লেখাপড়া শিখাইবে। খোকা মানুষ হইয়া দেশের দশের একজন হইয়া এই বন্যা প্রসঙ্গেই হয়ত একদিন—না, অতটা সুখের কল্পনা করিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয় এত সূক্ষ্মতন্তু বুঝি টিকিবে না, মনে হয় এত মধুর গন্ধ বুঝি উবিয়া যাইবে।

বাঁশী কলাগাছ কাটিয়া কচুরী আটকাইয়া তাহার উপর গাইটাকে নেহাৎ ভগবান ভরসা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। জলের ভিতর কি দারুণ অসুবিধায় যে সে বাঁশ কাটিয়া মাচা বাঁধিয়া ফেলিল। মাচার উপর রান্না—থাকা, ঘুমান। নৌকায় করিয়া সে হাট করে, হাটও বসে নৌকার নৌকায়। তাহারই মধ্যে সে তরিতরকারি ডাল প্রভৃতি কেনাবেচা করিয়া

দু'পয়সা যোগাড় করিয়া নিজের বেসাতি করিয়া আনে। মাছ বিক্রয় বন্ধ। ঘরের মেঝেয়ও মাছ কিলবিল করে, উঠানে কলাতলায় যেখানে সেখানে মাছ। ধরিলেই হইল। পুকুর খালবিল সব একত্র, সব মাছ সব যায়গায় ঘোরাফেরা করিতেছে। স্রোতের জলে বড়শীতে সুবিধা হয় না। জলও অগভীর নয়—যে পোলো, হেচি বাহিবে। সুতরাং কোচ শড়কি ছাড়া অন্য উপায় নাই। বাঁশীও অবসর সময় ভালমন্দ দু'দশটা মাছ কোপাইবার জন্য তার শড়কি বাহির করিয়াছে। বাতাবি-লেবুতলায় দাঁড়া জাগাইয়া একটা বড় রুই মাছ ঘোরা ফেরা করিতেছে মা এ সংবাদ দিতেই সে শড়কি নিয়া বাহির হইল। ওখানে জল কম নয়—একহাটু কি উরু অবধি জল। বরান্দায় বসিয়া সুবিধা হইল না। মাছটা পালাইয়া বাঁচিল।

জল ঝাঁপাইয়া সুবো একসময় আসিয়া হাজির। বাঁশী বলিল, ডোঙ্গা এই বারান্দাতক আন্‌বি—তা'না। যাক—খবর কি? মাসিমারা সব ভাল? সুরো সে-সব কথার ধার দিয়াও ঘেঁসিল না—হাতের মস্ত একটা টোপলা বাঁশীর সামনে খুলিয়া বলিল, এই দেহ বাঁশীদা'। আজ পাইছি। তাও এহেবারে ঘরের মধ্যি, সিন্দুকের তলায় পলায়ে ছিল।

কলাপাতায় বাঁধা সের দুই কাটা মাছ। লালচে, বড় বড়। সুরো এবার সবিস্তারে বলিল, পুবপাড়ায় গোলদারগো ঘরের কানাচি বড় একটা গজাল মাছ কোপাইছে। বিশ্বেসগো রান্নাঘরে দুটো কাতলার পোনা আর একটা ভ্যাওট আর আমাগো বড় ঘরের সিন্দুকের তলায় মাঝে মাঝে ঘা দিচ্ছিল—কোপায়ে বার করে আনলাম—মাছের রং দেহো, পাকা, —শের সা'র আমলের পাকা 'রুথ' মাছ। বাবা আর মা তোমাগো দিতি পাঠালেন।

সুস্বাদু মাছ—বাঁশীর কাঁচা-ই খাইতে ইচ্ছা হইল। সুরো দাঁড়াইল না। তাহারাও মাচাবাসী—আজ প্রায় পঁচিশ দিন মাচায় বাস করিয়া এই জীবনটাই কেমন অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। আবার ইহার মধ্যে

হাসি-আনন্দের, আত্মীয়তা-অভ্যর্থনার লীলা ফুটিয়াছে। মানুষ তাহার নিজের অবস্থায় কত সহজেই না স্বাভাবিক হইতে চায়।

তোলা উনুনে দাসের মেয়ে কত কষ্টে অসুবিধায় সেই মাছ রান্না করিল। বাঁশী চাহিয়া চাহিয়া খাইল। মা বলিল—অমন রুথ মাছটা সেদিন ফসকাল। তা তুই যে এ্যাড়ো, যুতি, শড়কি, কোচ সব তুলে রাখলি—তো মাছ হাটে' পাতে উঠে আসপে?

বাঁশী খাইয়া উঠিয়া মরিচা ধরা লোহায় সযত্নে ধার দিল। এগুলি যেন জীবনে অপ্রয়োজনীয় হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু—নির্ধারিত মৃত্যু যেন নিতান্তই আসিয়া গিয়াছে। তাহার কাছে বাঁচিবার এই সমস্ত ক্ষুদ্র উপকরণ প্রচণ্ড উপহাসের মত দেখাইবে যেন এই লজ্জায় সে এই সমস্তই লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

শব্দে বাঁশীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

মেঝের জলে কি শব্দ হইতেছে। বাঁশী নিশ্বাস রোধ করিয়া উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে শিয়রে বেড়ার গায়ে রাখা শানিত অস্ত্র তুলিয়া লইল। দিনের বেলায় মাছ পায় নাই—রাত্রে জোৎস্নায় বাহির হইবে ভাবিয়াছিল—ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর কেহ ডাকে নাই।

হ্যাঁ, ঐ যে ছপ্ ছপ্—বোধ হয় লেজের বাড়ি। সেই পলাতক রুই মাছটাই কোন ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া এখন হয়ত বাহির হইতে পরিতেছে না। তাহার জিহ্বায় জল আসিল। ঘরে কত জল হইবে? হাতে ধরা অসম্ভব! ফুড়িয়া তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে—সফল হইতেও পারে। মাচার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আর একবার সে শব্দ লক্ষ্য করিল। তাহার মাচার ঠিক নীচে—শিকার সে নিশ্চয় বিদ্ধ করিতে পারিবে—বরং নামিয়া হাতে ধরিতে গেলেই জলের নাড়ায় দৌড়িয়া পালাইবে। বাঁশীরাম শব্দ লক্ষ্য

করিয়া কোচ ছুড়িয়া অনুভব করিল, তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে—একটু নড়িয়া এতক্ষণে শিকার একেবারে নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

এক ঠেলায় সে দাসের মেয়েকে জাগাইল! সে উঠিয়া বসিয়াই বলিল, খোকা, খোকা কই?

কোচের যে অংশটা তখনও বাঁশীর হাতে ছিল তাহা ছাড়িয়া দিয়া সে মাচা হাতড়াইতে লাগিল। দাসের মেয়ে কম্পিত হস্তে বেড়ার গায়ে বাঁধা ঘটের মুখে রাখা প্রদীপ জ্বালাইল। কেরোসিনের সলিতাটি প্রচুর ধুম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। মাচার উপর খোকা নাই। নীচে জল, তবে খোকা কোথায়? মুহূর্তে বাঁশীর মুখ মৃতের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। শেষে কি নিজের হাতে····?

আলোটা ধরিয়া দাসের মেয়ে জলের ভিতর অনুসন্ধান করিতে যাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। খোকার পিঠের অস্ত্র বুক ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে জলটা তখনও লাল রহিয়াছে।

মুড়িওয়ালা

"ভাই সন্তোষ, সত্বর ফিরিয়া আয়। বাবা তোর জন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছেন, মা শয্যা নিয়াছেন। যেখানে থাকিস পত্র দিলে টাকা পাঠাইয়া দিব। তুই আমার নিকট থাকিতে চাহিলে সে ব্যবস্থাও হইতে পারিবে। ইতি তোর দিদি। তালপুকুর, কুমিল্লা।"

এই বিজ্ঞাপনটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আপনারা কেহ কি লক্ষ্য করিয়াছিলেন? করিলেও এত দিন নিশ্চয় ভুলিয়া গিয়াছেন। সত্যই তো কম দিন হয় নাই। ১৯৩৫ সালের কথা। দেখিতে দেখিতে ছয়টা বৎসর পার হইয়া গেল। আমি আই-এ পরীক্ষার ফল জানিতে পারিয়া একদিন

গোপনে গা ঢাকা দিয়াছিলাম। আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। দিদি সবার বড়। আমরা সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতাম, ভালোও বাসিতাম। দিদিও কেন জানি না দাদা-মেজদার অপেক্ষা আমাকে একটু বেশী ভালোবাসিত। নিজে স্নান করাইয়া, জামা পরাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া, ভাবিতেও লজ্জাবোধ হয়—কোন কোনদিন খাওয়াইয়া দিয়া পর্যন্ত, আমাকে ইস্কুলে পাঠাইত। তার পর অবশ্য দিদির বিবাহ হইল, শ্বশুরবাড়ি গেল। আমিও বড় হইলাম,—ইস্কুল ছাড়িয়া কলেজে গেলাম। সেই দিদি কিনা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া ডাকিয়াছে—ভাই সন্তোষ, সত্বর ফিরিয়া আয়। এমন কি, দাদা মেজদার সঙ্গে না থাকিয়া দিদির কাছে তার শ্বশুরবাড়ি থাকিয়া পড়িবার সুযোগ পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তবুও আমার মন ফিরিল না।

কারণটা অবশ্য প্রথমত এবং মুখ্যত একটা পরাজয়ের লজ্জা। কিন্তু গৌণ কারণ এই দাঁড়াইল—তিন-চার মাস পথে পথে ঘুরিয়া পৃথিবী সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হইয়া গেল। বাল্য-কৈশোর-যৌবনে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকের সহজ আশ্রয়ে নিরাপদে যে মন বর্ধিত হইয়া উঠে, আমার উনিশ বৎসরের সেই কল্পনাপ্রবণ আশাবাদী মন নিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, ধারণা ছিল, পথে পথে অজস্র সুযোগ আমারই জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, আমি গেলেই পরম আগ্রহে হাত বাড়াইয়া আহ্বান করিবে। গল্প-উপন্যাসে এমনই কত অসহায় যুবকের কথা পড়িয়াছি তাহারা পথের সম্পদেই জীবন জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ-বা না খাইয়া পথে পথে ঘুরিল, কলের জল খাইল, পরে হতাশ অবসন্ন চিত্তে পথ অতিক্রমণ করিতে যাইয়া যে মোটরের তলায় চাপা পড়িল, তাহার মধ্যে হয় কোন অফিসের বড় সাহেব, না হয় কোন বড় জমিদার ও তার ষোড়শী কন্যা তাহার শিথিল তনু সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। তার পরের অধ্যায় বলা নিষ্প্রয়োজন, হয় ডালহাউসী স্কোয়ারে কোন বড় অফিসে একজন ফ্যান-ফোনওয়ালা অফিসার ; না হয় জমিদার গৃহে সুখে লালিত ভাবী জামাতা।

পথে কেহ কাঁটা বিছাইয়া রাখে নাই, কলেও ঠিক সময়মত জল আসে। সুতরাং কলের জল খাইয়া পথে পথে ঘুরিতে কেহ বাধা দিল না। কিন্তু কোনও মূল্যবান মোটরের তলায় শীর্ণ ক্লান্ত দেহটি বিছাইয়া দিতে শঙ্কা ছাড়িতে চাহিল না। শেষ পর্যন্ত একদিন কর্পোরেশনের একখানা ময়লাবাহী লরীতে চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম। বুঝিলাম, আমার ভাগ্য এভাবে ঘুরিবে না। পরীক্ষার পরাজয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম, জীবন সংগ্রামে পরাজয়ে সেই গৃহেই প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা হইল না।

অনেক জায়গায় ঘুরিয়া অনেক কষ্টে অবশেষে একটি টিউশানি জুটিল। সেটিকে ঠিক টিউশানি বলাও চলে না। কারণ ছাত্রটির পিতার একটি চিঁড়ামুড়ির দোকান ছিল, আমাকে সেখানে খাতা লিখিতে হইত, সময় অসময়ে বিক্রয় করিতেও হইত। ছাত্রটিকে পড়ানো আমার উপরি খাটুনি এবং সকাল বিকাল সেই খাটুনির দরুণ আমি দুইবেলা খোরাকি পাইতাম। ইহা ব্যতীত পাচ টাকা মাহিয়ানা এবং দোকানের বরাদ্দ অনুযায়ী সকালে দুই পয়সার জলপানি পাইতাম।

সুতরাং কষ্টে থাকিলেও আমার অবস্থা ঘুরিতে বিলম্ব হইল না। বৎসরান্তে আমার হাতে নগদ পঁয়ত্রিশ টাকার মত জমিল। এক বৎসর এই অজ্ঞাতবাসে আমার মানসিক চাঞ্চল্য যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং গোপন রাখিতে রাখিতে আমার গায়ের কলেজী গন্ধও দূরীভূত হইয়াছিল। তাই একদিন সাহস করিয়া নিজেই একটি চিঁড়ামুড়ির দোকান খুলিলাম। দুই-তিন মাস পরে হিসাব করিয়া দেখিলাম, খরচ খরচা বাদে মাসে বারো তের টাকা মুনাফা হইতেছে।

আমার দোকানটি ভদ্রপল্লীতে, খরিদ্দার সবই ভদ্রলোক না হইলেও অনেক ভদ্রলোক আমার কাছে জিনিষ কিনিতেন। উঁহাদের মধ্যে একজনকে আমার বড় ভালো লাগিত। সে আমার সমবয়সী, নাম বর্ধমান বসু, বি-এ পড়ে। রোজ সকালে সে এক পয়সার চিঁড়াভাজা আর

মুড়কি কিনিতে আসিত। ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। ছেলেটি দরিদ্র, টিউশানি করিয়া কষ্টে স্বষ্টে পড়া চালাইতেছে। বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামাতা, অনূঢ়া ভগিনী, সকলেই তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছেন। টিউশানির টাকায় নিজের খরচ চালাইয়া বাড়িতেও কিছু না পাঠাইলে সংসার চলে না। কৃচ্ছ্রতার বেদনায় আমাদের হৃদয়তন্ত্রী একই স্বরে ঝংকার দিয়া উঠিল। তাহারই অনুপ্রেরণায় আমি কোন ঠিকানা না দিয়া প্রায় দুই বৎসর পরে বাবাকে মাকে এবং দিদিকে পত্র দিলাম এবং বাবাকে কয়েকটি টাকা পাঠাইয়া দিলাম। আমার কঠোর শ্রমে অর্জিত অর্থ বাবা-মা খরচ করিতে পারিবেন ভাবিয়া মনে সত্যই যেন আনন্দ হইল, উৎসাহও পাইলাম। বর্ধমানকে আমার পরম বন্ধু মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু সামান্য কয়েকটি টাকা পাঠাইয়া যখন আমার হিসাব লিখিতে বসিলাম, বুঝিলাম—আমি কতই নগণ্য। আমি মাসিক তের-চৌদ্দ টাকা উপার্জন করিয়া নিজেই বা কি নিব, বাড়ীতে বাবা-মাকেই বা কি দিব? দিদিকেও দু'টা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দু'টি টাকা দিয়া দিদি করিবেই বা কি? সে অমন দশ-বিশ টাকা আমাদের খাওয়াইতে উড়াইয়া দিত।

আর ঐ বর্ধমান। এখন সে কষ্ট করিয়া পড়াশুনা চালাইতেছে, পাস করিয়া বড় চাকুরী পাইবে, অজস্র উপার্জন করিবে, এই আশাতেই না সে এত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে! তখন কি আর বর্ধমান আমাকে খাতির করিবে, না এক পয়সার মুড়ি কিনিতে আসিয়া একগাল হাসিবে? নিজের উপর, নিজ-কৃত কর্মের উপর আমি বীতশ্রদ্ধ হইলাম। আজ এই দীর্ঘ দুই বৎসর পরে সত্যই অনুশোচনা জাগিল। মনে হইল, বাড়ি হইতে পালাইয়া ভুল করিয়াছি, চিঁড়ামুড়ির দোকান করিয়া ভুল করিয়াছি, লেখাপড়া ছাড়িয়া গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিলাম—শিক্ষার মূল্য বুঝিলাম না, এ জীবন

ব্যর্থ হইল। বর্ধমানের সহিত নিজের তুলনা করিয়া আত্মগ্লানিতে আমার মন ভরিয়া গেল। মনে মনে আমি নিতান্ত মুসড়িয়া পড়িলাম।

পরদিন নিয়মিত একগাল হাসিয়া বর্ধমান চিঁড়াভাজা কিনিতে আসিল। আজ আর তাহাকে সহজ সৌহার্দ্যে সম্ভাষণ জানাইতে পারিলাম না। মনে কেবল বাধিতে লাগিল—আমি তাহাপেক্ষা অনেক ছোট, সকল বিষয়ে ছোট, নিতান্ত অবহেলার পাত্র। "শ্রমের মর্যাদা" কথাটি ভালো শুনায় ততক্ষণ, যতক্ষণ সেই শ্রম স্বেচ্ছাকৃত থাকে, অবশ্যগ্রহণীয় হইয়া উঠিলেই বুঝি তাঁহার মর্যাদার তাপমান যন্ত্রে পারাটা নিমিষে শূন্যের কোঠায় নামিয়া আসে। কোনও রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিজের জুতা নিজে পালিস করিলে সে কাহিনী শিশুদের পাঠ্য পুস্তকেও স্থান পায় কিন্তু প্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রীত্ব হারাইয়া যদি জুতা পালিস করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিতে হয়, তবে ক'জন উৎসাহী তাহার নিকট জুতা জমা দিতে ছুটিবেন, তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বস্তুত নিয়ত যে কাজ করিব, সে কাজের প্রতিবিম্বে মনটি ছায়াচ্ছন্ন না হইয়া পারে না।

কিন্তু আমার ঔদাস্যে বর্ধমান পরাজিত হইল না। সে পূর্বানুরূপ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে এটা-ওটা বলিতে লাগিল। তারপর এক সময় সে যে কি বলিয়া চলিয়া গেল সম্যক স্মরণ করিতে পারিলাম না।

আমার মনটা যে কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছিল জানি না। গৃহে ফেলিয়া আসা বড় বড় গ্রন্থগুলির আশেপাশে সে যখন মৌমাছির মত চক্র দিতেছে, সেই সময় তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া লজ্জিত হইলাম। একজন খরিদ্দার বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন তাহাকে ডাকিয়া প্রসন্নমুখে অভ্যর্থনা করিলাম এবং চিঁড়াবাতাসা দিবার পর অতি আগ্রহে নূতন গুড়ের সংবাদ দিলাম এবং নলেন গুড়ের গুণ বর্ণনা করিয়া এক পোয়া গছাইয়াও দিলাম। খরিদ্দারটি চলিয়া গেলে আবার আমার মন তলাইয়া গেল।

বর্ধমান নিজের অজ্ঞাতসারে আমার মন প্রলুব্ধ করিতেছিল। সে এক অলকাপুরীর রহস্যময় স্বপ্ন। বীণাপাণির সভাতলে যেন এক বিরাট আয়োজন ঘটিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ম্যাথ্যু আরনল্ড, গোর্কি, শ', মিল, কালিদাস, ভবভূতি, মল্লিনাথের মেলা। বর্ধমানের পিছু পিছু আমার মনটা মাছি-ওড়া, কদলি-ঝোলানো গুড়ের পাত্র, চিঁড়ামুড়ির ডালা সাজানো দোকান ফেলিয়া সেই রহস্যপুরীর সন্ধানে গোপন অভিসারে উধাও হয়। মনে পড়ে বাবার বাঁধানো শরৎ গ্রন্থাবলী, মনে পড়ে মেজদার 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যান'। পাছে আমরা কেউ চুরি করি, সেই ভয়ে দাদা আলমারীতে তালা লাগাইয়া রাখিত, চাবি থাকিত দিদিব কাছে। দিদির কাছে বায়না ধরিয়া কত দিন গোপনে মেঘদূত পড়িয়াছি। দোকানে বসিয়া বসিয়া আমি সেই অলকাপুরীর ছবি মনে করিতে থাকি।

এইভাবে এক পয়সার চিঁড়াভাজা কিনিতে আসিয়া বর্ধমান আমাকে যে সব গল্প শুনাইত, সারাদিন তাহারই অনুরণন আমার চিন্তাতন্ত্রীতে ঝংকাব তুলিত। আবার কখন সন্ধ্যা হইবে, আবার কখন বর্ধমান আসিবে, সেই আশায় উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে বর্ধমান প্রায়ই আসিত না, আসিলেও কিছু কিনিত না। বুঝিতাম—দুই বেলা জল খাইবার সংস্থান তাহার নাই। নানা ছলে তাহাকে খাওয়াইতে যাইতাম, কিন্তু সে বুদ্ধিমান ছেলে, আমার ছলনা বার বার ব্যর্থ হইত।

কোন্ শুভক্ষণে বর্ধমানকে কথায় কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, আমি ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়িয়াছি, তদবধি সে আমাকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখিতে সুরু করিয়াছে। সে আসিয়া কলেজের গল্প, অধ্যাপকের গল্প করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত ম্যালথাসের থিওরি, ম্যাথু আরনল্ড এমন কি, ল'-অব-রিলেটিভিটি প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ আওড়ায়। শুনিতে ভালো লাগে, শুনিতে শুনিতে আমি কেমন অজ্ঞাত বেদনার সহিত অহেতুক পুলক অনুভব করি। দু'চারিটি মতবাদ বা উদ্ধৃতি আমারও মনে পড়িয়া যায়।

অবশেষে একদিন বর্ধমানের কথাতেই সায় দিলাম। সে বইপত্র যোগাড় করিয়া দিল, আমি আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম এবং রোজ রাত্রে বর্ধমান আমাকে পড়াইতে ও আমার সহিত রাত্রে আহার করিতে স্বীকার করিল। আট মাস চেষ্টার পর পরীক্ষা দিয়া সে বার আমি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম।

আমার উৎসাহ বাড়িল। দোকানের কাজে এতদিন কোনও সহায়ক ছিল না, এবার একজন লোক রাখিলাম। লোকটি ভালো বলিয়াই মনে হইল। তা ছাড়া বয়সও হইয়াছে, দোকানের কাজকর্মও জানে। তাহাকে নিয়া কোনই বেগ পাইতে হইল না। এমনকি, সে আসিয়া বিক্রয় বাড়াইবার জন্য চিঁড়ামুড়ির সহিত বেগুনি-ফুলুরিও ভাজিতে লাগিল। সত্যই আমার বেশ দু'পয়সা উপার্জন হইতেছিল।

অপর পক্ষে আমার লোভও বাড়িতেছিল। দুপুরে সাধারণত খরিদ্দার কম থাকিত। কর্মচারিটি খাইয়া একটু গড়াগড়ি দিত। আমিও একটি নোটবই পকেটে ফেলিয়া কলেজের পথে পা বাড়াইতাম। বর্ধমান আমার সংকোচ ভাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। চুপি চুপি একটি কোণে বসিয়া অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতাম, কোনদিন নোট টুকিয়া আনিতাম; বর্ধমানও আমাকে অশেষ সাহায্য করিতেছিল।

এমনই একদিন ক্লাস করিয়া খাতাটি পকেটে পুরিয়া দোকানের দিকে চলিয়াছি। আমি দোকানে বসিলে কর্মচারিটি মাল খরিদ করিতে যাইবে সেজন্য আমি ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু টেনিসনের একটি কবিতার ছবি আমার মন হইতে কিছুতেই মুছিতে চাহিতেছে না—

The splendour falls on castle walls
And snowy summits old in story:
The long light shakes across the lakes,
And the wild cataract leaps in glory.

সেই দুর্গপ্রাকারে প্রতিফলিত জ্যোতি যাহা কত কাহিনী বিজড়িত তুষারমৌলি পর্বতশিখর চুম্বন করিয়া শান্ত হ্রদের বুকে লম্বমান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই একটি রেখা যেন আমার পথের সরু গলিটার মুখে পানের দোকানের স্থির আর্শিটাতে লম্বিত দেখিলাম। আর সেই—

Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying.

Blow bugle, blow ; answer, echoes, dying, dying, dying.

অধ্যাপকের মুখনিঃসৃত সেই স্বর যেন কতদূর হইতে, কোন অতীতের গহন অরণ্য হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমার নিকট মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

বৈকালের স্বর্ণাভ আলোকে যে কি যাদু ছিল জানি না, কিন্তু নিজের অবস্থায় আর আমি তিলেক দুঃখিত হইলাম না। মনে হইল যেন আমি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি—যেন আমি দুঃখের অতীত লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছি।

সোনার আকাশ পথে ঘাটে সোনার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে। আকাশের ঐ অফুরন্ত আলোক-প্রবাহে যেন কাহার পূরবী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন বিরাট প্রাণ-উৎস হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়া অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে। উহাকে অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে বুঝি জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। মনে পড়িল—

O love, they die in yon rich sky,
They faint on hill or field or river,
Our echoes roll from soul to soul,
And grow for ever and for ever.

আমার আত্মায় যেন কাহার আহ্বান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না।

দোকানে আর ফিরিতে পারিলাম না। সেই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পরিসরের

মধ্যে আমার এই বিরাট অনুভূতির কোথায় স্ফুরণ হইবে? এখান হইতে ভাবিতে সেই বিকি-কিনির ক্ষেত্রকে যেন অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। আমার মন সেই অমৃত-আলোকে উভয় পক্ষে ভর করিয়া উড্ডীন হইতে চাহিল। কখন ট্রামে উঠিলাম, কখন ময়দানে নামিলাম, জানিতেও পারি নাই। ইডেন গার্ডেনের সামনে খোলা প্রান্তরে একান্ত একাকী বসিয়া আকাশের সেই অপরিমেয় আনন্দব্যাপ্তিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গেলাম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইল। পথিপার্শ্বে অজস্র আলোক এবং আকাশে অগণিত নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল। আমি যেন আত্মস্থ হইলাম। উঠিয়া ধীরে ধীরে দোকানের দিকে পা বাড়াইলাম। আমার মনটি আজ যেন পাখীর পালকের মত হালকা হইয়া গিয়াছে।

দোকানে বিজলি বাতি ছিল না। একটি হ্যারিকেন ঝাড়িয়া পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া আলো জ্বালিতাম। তাহাতে যেটুকু আলো হইত তাহাতেই আমার চলিত। দেওয়ালে লক্ষ্মী ও গণেশের পটের কাছে একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিত।

ঘরে ঢুকিয়া ধুপের মৃদু সৌরভ পাইয়া অভ্যাসবশে করযোড়ে পটের সম্মুখে প্রণাম করিলাম। তক্তপোষটিতে বসিতে যাইব, দেখি—সেখানে কে বসিয়া আছে। দেখিয়া যেন চিনিলাম। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোকে লম্বমান কদলী ও তিলের চাকার দীর্ঘছায়া পড়িয়াছে—তাহারই আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়া কে একজন বসিয়া আছে। তবুও চিনিলাম—মেজদার বন্ধু ভূপেশদা। জিজ্ঞাসিলাম— 'ভূপেশদা না?'

ভূপেশদা' হাসিয়া বলিলেন, চিনেছিস তবে? আমার তো ভয় ছিল চিনলেও হয়ত পরিচয় দিবি নে। তুই নিজে তো দিব্যি মুড়িওয়ালা সেজে বসেছিস।

ভূপেশদাকে রাত্রে ছাড়িলাম না। ছাড়িলেও তিনি যে কোথায় যাইবেন

স্থির ছিল না। সুতরাং খাইয়া-দাইয়া আমার কাছেই থাকিলেন। আমাকে বাড়ি যাইবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন, তারপর তাহার নিজের কথা পাড়িলেন। শুনিয়া আমার হাত-পা উদরে প্রবেশ করিল, ভূপেশদা ইংরাজিতে ফাষ্ট ক্লাস পাইয়া এম-এ পাস করিয়াছে; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। আশা ছিল কোনও কলেজে লেকচারারের পদ পাইবে, তাহা দূরে থাক্, একটা ইস্কুলমাষ্টারিও জুটিতেছে না। যা-তা কাজ তো আর সে করিতে পারে না। আবার মুস্কিল এই, ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ-কে অল্প মাহিনার চাকুরিতেও কেহ নিয়োগ করিতে চাহে না, জানে সে স্থায়ী হইবে না। তার ফল এই হইয়াছে—ভূপেশদার বেকারত্বই স্থায়ী হইতে চলিয়াছে।

আমি যে খুলনা হইতে পালাইয়া কলিকাতায় আসিয়া চিঁড়ামুড়ির দোকান ফাঁদিয়া বসিয়াছি, তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না। এই পথে দু-একদিন যাইতে যাইতে মুড়িওয়ালাকে দেখিলেও হয়ত কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই, আজ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই সে আমার খোঁজ করিয়াছে এবং দোকানে না পাইয়া কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে উঠিয়া বসিয়াছে। বুঝিলাম, ভূপেশদা নিঃসম্বল এবং এই কপর্দকশূন্য অবস্থায় না পড়িলে মুড়িওয়ালার দুয়ারে সে আসিত না। অবশেষে সে কি না আমার কাছেই উপদেশ চাহিয়া বসিল। জানিতাম পছন্দ হইবে না, তবুও বলিলাম—যদি ইচ্ছা কর, কোন ছোট খাট ব্যবসায় ধরিতে পার। ভূপেশদা নিরুত্তর রহিল।

পরদিন সকালে বলিল „গুটি দশেক টাকা দিতে পারিস, বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসতাম। বাড়ি হইতে ফিরিয়াই যে টাকা প্রত্যর্পণ করিবে, সে ভরসাও পাইলাম। দিব না ভাবিয়াছিলাম, তবু মনে বাধিল—মেজদারই তো বন্ধু! যদি মেজদা চাহিত, তবে কি না দিয়া পারিতাম পাঁচটি টাকা দিয়া ভূপেশদাকে বিদায় দিলাম।

তিন দিন পরে হেদুয়ার মোড়ে ভূপেশদাকে পথে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়াই একখানা শ্যামবাজারগামী বাসে চাপিয়া সে আত্মগোপন করিল। বুঝিলাম, সে বাড়ি যায় নাই, সহজে যাইবেও না।

টেনিসনের কবিতা বিস্বাদ লাগিতে লাগিল। ম্যাকবেথের কথায় ভূপেশদাকে মনে পড়িল। সেক্সপীয়র চর্বণ করিয়া সে পথ মাপিয়া বেড়াইতেছে। বইপত্র ও নোটখাতা পাঁজা বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি—পুরাতন কাগজ জ্ঞানে কর্মচারিটি উহা দিয়া ঠোঙ্গা বানাইলেও বোধ হয় খুব দুঃখিত হইব না।

নেহাৎ গল্প হইলে বলিতে পারিতাম—তারপর ভূপেশদা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আমার সহিত আসিয়া ব্যবসায়ে যোগ দিল এবং মুড়ি মুড়কি ফিরি করিয়া কালক্রমে আমরা পুঁজিপতি হইলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কার্যত সে সব কিছুই হইল না। কেবল বি-এ পাশ করিয়া বর্ধমান একটি মারোয়াড়ী গদিতে চাকুরি পাইয়া বারাসতে খেজুর গুড় কিনিতে গিয়াছে। সে-ই কালেভদ্রে কখন কখন আসিয়া দোকানে বসে, একথা সেকথায় গুড়ের বাজার দর জানায়। আর আমার ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না, বর্তমানেও মুড়িই ভাজিতেছি! জানি না, ভূপেশদা' এখনও ভেরেণ্ডা ভাজিতেছেন কি না।

পরিচয়

আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছোট স্কুলটিতেও সংবাদ পৌঁছিয়াছিল, সুধীর দাস এবার পল্লীগীতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল, তাহারই কয়েক সংখ্যা সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলাম, ট্রেনে পড়িবার জন্য। পড়িতে পড়িতে চলিতেছিলাম, দীর্ঘকাল প্রচলিত পল্লীগীতি সংগ্রহ, সমালোচনা এবং তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানের সাবলীল প্রকাশে প্রবন্ধগুলি মনোরম, সাহিত্যরসিকের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করে। সুধীর দাসের উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িল।

বাড়ি হইতে একটা কাগজে মুড়িয়া হালুয়া আর লুচি দিয়াছিল। এক সময় বই মুড়িয়া রাখিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম। একটি গীতির চরণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমার সমস্ত শৈশব ও কৈশোরের ছায়া যেন সেই ছড়াটির গবাক্ষ পথে বার বার আমার নয়নে ভাসিয়া উঠিতেছিল। বয়স বাড়িলেও সেই ফেলিয়া আসা দূর অতীতের দিন গুলির প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম।

আমার হাতে হালুয়ার মোড়ক ঘৃতাক্ত হইয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে করিতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। যে ছড়াটি আমাকে ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল, আমার হাতের মোড়কের কাগজ-খানিতেও সেই ছড়াটি ছাপা। পরম কৌতূহলে বাকী হালুয়াটুকু লুচির উপর তুলিয়া লইয়া সমগ্র কাগজখানি মেলিয়া ধরিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। যে সকল ছড়া সুধীর দাসের প্রবন্ধে পড়িতেছিলাম তাহার অনেকগুলি আমার হাতের কাগজখানিতে ছাপা রহিয়াছে। ক্রমে সকল বিষয় লক্ষ্য করিলাম, হালুয়া ও লুচি মুড়িতে আমার পুরাতন কলেজ

ম্যাগাজিনের কয়েকটি পাতা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে প্রকাশচন্দ্র সেন নামক আমার একজন সহপাঠীর একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ রহিয়াছে। সুধীর দাস ও প্রকাশ সেনের প্রবন্ধ দু'টি পাশাপাশি রাখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, আজ যে প্রবন্ধে 'ডক্টরেট' জুটাইয়াছে, দশ বৎসর পূর্বে তাহারই সূচনা আমাদের কলেজ পত্রিকায় প্রকাশ সেন প্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশকে বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রকাশকে মনে পড়িল তাহার জ্ঞানগম্ভীর সৌম্যসুন্দর মূর্তিতে। কলেজে তাহার বেশি লোকের সহিত পরিচয় ছিল না। আমরা যাহারা চিনিতাম, নিঃসন্দেহে জানিতাম, সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। গভীর বিষয়সমূহে তার ঐকান্তিক অনুরাগ আমাদের অন্তর হইতে তাহাকে সমীহ করিতে বাধ্য করাইত। প্রকাশের সমাচার দীর্ঘকাল পাই না, কিন্তু সে যে এম-এ পড়ে নাই বা পড়িতে পায় নাই এই কথাই যেন কার কাছে শুনিয়াছিলাম। কলিকাতায় চলিয়াছি, যদি সেখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায় তবে সব কথা একবার জিজ্ঞাসা করি, মনে মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। সুধীর দাসের প্রবন্ধে আর মন বসিল না।

কলিকাতায় আসিয়া আমার কয়েকদিন নানা কাজে ব্যস্তভাবে কাটিল। তাহার পর আমার এক পরম আত্মীয়ের খোঁজে একদিন সার্পেণ্টাইন লেনে গেলাম। কলেজ বন্ধ হইয়াছে, তবু বিশেষ আত্মীয় মহাশয় গৃহে প্রত্যাগমন না করায়, তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা বিশেষতঃ তাহার ভগিনী আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া দিয়াছেন, শ্রীমানের খোঁজ লইতে, তাই তাহার সার্পেণ্টাইন লেনের মেস ঘুরিয়া আসিতে হইল। শুনিয়া আসিলাম, শ্রীমান একজন সহপাঠীর সহিত বাঁকুড়ায় গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন।

সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারে বসিয়া পরমাত্মীয়টির গতিবিধি চিন্তা করিতেছিলাম। ঐ বয়স এক সময়ে আমারও ছিল, এখন নাই। অধিকন্তু পল্লীগ্রামে মাষ্টারি করি বলিয়া মনটা সদা সন্ত্রস্ত এবং অল্পবয়স্কদিগের

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্র' নামক প্রবন্ধ পড়াইয়া বিজ্ঞ হইয়াছি বলিয়া সর্বদা উপদেশ দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকি। শ্রীমান যে নেহাৎ নিরামিষ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ায় ডুব মারেন নাই এই সন্দেহে আমার মন নানা কল্পনা করিতেছিল। তবে তাহার পত্রে ও কার্যে সমতা রহিয়াছে। কালই শ্বশুর মহাশয়কে পত্র দিতে হইবে, দিলীপ বাঁকুড়ায় গিয়াছে, সে কথা সত্য, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন ইত্যাদি। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে বলা যত সহজ, নিজে নিশ্চিন্ত হওয়া তত কঠিন। আমার মনে কেবলই সন্দেহ হইতে লাগিল, শ্রীমানের সহপাঠীর বাটিতে অন্য কোন আকর্ষণ নাই তো! পর পর তিনবার বাঁকুড়ায় যাওয়া, অর্থাৎ ছুটি পাইলেই একবার বাঁকুড়া— ইহার মধ্যে যে গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, আমার মাষ্টারি মন নির্লজ্জভাবে তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

আকাশে সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে, সেই চাঁদ আমাকে সেণ্ট জেমস স্কোয়ার হইতে শূন্যলোকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। একটি নিভৃত পল্লী-পুষ্করিণী। তীরে গুবাক চালিতা বন। তাহারই কালো ছায়া পড়িয়া পুকুরের পশ্চিম পাড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। জনবিরল চত্তল জ্যোৎস্নালোকে হাসিতেছে। সহসা জল ফুলিয়া উঠিল, ছোট ছোট ঢেউয়ে নিঃশব্দে চন্দ্রকলা আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল, জলের বুকে জ্যোৎস্না চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কে যেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, এখন সিঁড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সিক্ত বেশবাস সংন্যস্ত করিল এবং একটি ক্ষুদ্র কলসীতে জল ভরিয়া কক্ষে তুলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। তাহার পদচিহ্নে জ্যোৎস্না ঝলসিত হইতেছে, সুডৌল কবরীতে, উন্নতবক্ষে জ্যোৎস্না সহস্র চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া আছে। ধীরে সোপান অতিক্রম করিয়া সে উঠিয়া আসিতেছে, তাহার সিক্ত বস্ত্রে মৃদু মধুর শব্দ উঠিতেছে। সহসা সে শব্দ থামিয়া গেল, তারপর চাপা স্বরে কলহাস্যে বলিয়া উঠিল, ও মা, আপনি। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দিলীপ কখন অলক্ষ্যে আসিয়া চত্বলে বসিয়া আছে। বলিল, আমাকে বুঝি ভয় করে না ?

তরুণী,—সিপ্রা, রেখা, লেখা, চিত্রা, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না যাহা হউক একটা কিছু আধুনিক নাম তাহার হইবে, সে এ কথার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না, শুধু আরও নিকটে আগাইয়া আসিয়া আরও নিম্নস্বরে বলিল, কাল কিন্তু কিছুতেই আপনার যাওয়া হতে পারে না। দু' এক পা অগ্রসর হইয়া যাইয়া আবার থামিয়া সে বলিল, এখানে বসে না থেকে বাড়ি আসুন। মিলু-পিনুদের না আজ ভাটিয়ালি শোনাবেন বলেছিলেন।

দিলীপ বলিল, ভাটিয়ালির আবার কি শোনাব, ওতো তোমাদের গ্রামের হাড়ি-মুচিরাও জানে।

জানে, তবু সহরের মানুষের মুখে শোনায় ভালো—বলিয়া সে পলাইয়া গেল।

দিলীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিকটেই একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িতে আমি ফিরিয়া তাকাইলাম, আমার পাশে অদূরে ঘাসের উপর কে শুইয়া আকাশের দিকে দূর নক্ষত্রলোকে কি নিরীক্ষণ করিতেছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোক তাহার মলিন বেশবাস ও ক্ষুধিত শীর্ণ মুখাবয়ব দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সঠিক চিনিতে পারিলাম না। পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া সযত্নে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমার পূর্ব-চিন্তিত চিত্রের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কেবল দিলীপকে মিলু-পিনুদের আসরে নিয়া বসাইয়াছি,সঙ্গীত সুরু হইবে, এমন সময় সহসা 'নারায়ণ' বলিয়া আমার পার্শ্বশায়িত ব্যক্তি ফুকারিয়া উঠিয়া বসিল। এই হুঙ্কারে আমার স্মৃতির গবাক্ষপথ উন্মুক্ত হইল ; দেখিলাম প্রকাশ বসিয়া আছে। জীবনে একমাত্র তাহাকেই এমনভাবে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি !

ত্রস্তে মুখের বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমি ঘুরিয়া বসিলাম। গ্রামে সন্ত্রস্ত থাকি ছাত্রদের জন্য, ধূমপান যে নির্দোষ এটা এখনও মনে মনে মানিতে পারি নাই।

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম। জিজ্ঞাসিলাম, প্রকাশ না?

সে উত্তর দিল—কে আপনি?

আপনি আবার কে, আমি সন্তোষ। আমি আরও নিকটে আগাইয়া গেলাম। এবার প্রকাশকে চিনিতে পারিলাম, কিন্তু কি চেহারা কি হইয়া গিয়াছে, দিনে দেখিলেও কি চিনিতে পারিতাম? হয়ত আমার চেহারারও পরিবর্তন হইয়াছে, আমি নিজে তাহা ধরিতে পারি না। কিন্তু প্রকাশের এ কি দীন করুণ মূর্তি!

বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া যতটা উচ্ছ্বসিত ব্যবহার পাইব আশা করিয়া ছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। প্রকাশ বরাবরই গম্ভীর প্রকৃতির, এখন যেন আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। সে যে আমার সমবয়সী এ কথা ভাবিতেও ভরসা হয় না। প্রকাশকে দেখিয়াই তাহার ও সুধীর দাসের পল্লীগীতি বিষয়ক প্রবন্ধের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু কথায় কথায় সে কথা ভুলিয়া গেলাম। প্রকাশের বিষয়ে অনেক কথাই শুনিলাম। সে যে সামান্য টাকার মসীজীবী, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে এবং প্রাত্যহিক প্রত্যাশার স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে একথাগুলি জানিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু সে যে কোথায় থাকে, কোথায় কাজ করে সে কথা সে নিজেও বলিল না, আমিও এড়াইয়া গেলাম। শুধু পরদিন সন্ধ্যাবেলায় এই সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারেই সাক্ষাৎ পাইব এই ভরসা পাইয়া আসিলাম।

মফস্বলের লোক কলিকাতায় আসিয়াছি, সুতরাং সঙ্গে লম্বা একটি ফর্দ আসিতে ভুল হয় নাই। পরদিন তাহারই কিছু সওদা করিতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টোরে যাইতেছি, দোকানের সাইন বোর্ডটা লক্ষ্য করিতেছি এমন সময় কে আমার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। তাকাইয়া চিনিলাম—আমার

প্রাক্তন ছাত্র অতীন। কলিকাতায় কলেজে আসিয়া সবে ভর্তি হইয়াছে, তাই বেশভূষা বদলাইলেও শিক্ষকের চরণ স্পর্শ করিবার স্পৃহা যায় নাই। জিজ্ঞাসিলাম, পড়াশুনা ভালো চলিতেছে কিনা। অতীনের কথায় কান না দিয়া লক্ষ্য করিলাম, তাহার হাতে একখানি নূতন পুস্তক। সেখানি চাহিয়া নিয়া বলিলাম,—কিনে নিয়ে এলে বুঝি?

অতীন বলিল—হ্যাঁ! আমাদের একজন অধ্যাপকের লেখা বই, এবার এই বইখানি লিখে তিনি ডক্টরেট্ উপাধি পেয়েছেন।

উল্‌টাইয়া দেখিলাম সুধীর দাসের লেখা—"পল্লীগীতি পরিচয়।" বই-খানি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম, সুধীরবাবু এখানে কোথায় থাকেন, জানো?

অতীন যেন বলিতে পাইয়া বর্তিয়া গেল। বলিল—বালিগঞ্জে। যাবেন তার কাছে? আমি যেতে পারি, আমার সঙ্গে পরিচয় আছে।

আমার সওদা করা পড়িয়া রহিল, অতীনকে লইয়া ট্রামে চাপিয়া বসিলাম। পথে বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সেই অজ্ঞাত সৌভাগ্যবান সুধীর দাসকে চিনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

একডালিয়া প্লেসের নির্জন নিভৃত অঞ্চলে ছোট একখানি বাড়ি। বাড়ির প্রাঙ্গণে খানিকটা খোলা জমি, দু'পাশে মরশুমি ফুলের চাষ। সে সব অতিক্রম করিয়া আমরা বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলাম। আমাকে বসাইয়া রাখিয়া অতীন বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল, বুঝিলাম এখানে তাহার অবাধ গতি। আমারই একজন ছাত্র কলিকাতায় আসিয়া এইরূপ একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের বাড়িতে সম্বন্ধ বিস্তার করিয়াছে দেখিয়া মনে মনে যেন কিঞ্চিৎ তৃপ্তি অনুভব করিলাম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর, খোলা জানালা পথে অনেক দূরের আকাশ ও কোন বাড়ির পাম গাছের শ্রেণী দেখা যাইতেছে। কলিকাতার নাগরিকতার সান্নিধ্য যেন এখানে স্তিমিত হইয়া গ্রাম্য সবুজতা ও সরসতার বুকে মিশিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, এমন পরিবেশ না থাকিলে কি গবেষণার সুবিধা হয়!

অতীন আমাকে ডাকিতে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে গেলাম। দ্বিতলে স্থধীর বাবুর পড়িবার ঘর, সেখানেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মনে মনে পুলক অনুভব করিলাম। শীতল মর্মরের সিঁড়ির মোড়ে উজ্জ্বল একটি পিতলের পাত্রে ছোট্ট সবুজ পাতা বিস্তার করিয়া একটি ক্ষুদ্র পাম আমাদের অভ্যর্থনা করিল। আর একটু উঠিতেই দ্বারদেশে একজন যুবককে দেখিলাম, তিনি সস্মিত মুখে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

অতীন বলিল—ইনিই ডক্টর দাস। প্রতিনমস্কার করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

আলাপ হইল। আলাপে মুগ্ধ হইলাম। বয়স অল্প হইলেও সেই অল্প বয়সের মধ্যেই কি গুরুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি পল্লী অঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, কৃষক ও সাধারণ পল্লীবাসীর সহিত নানা আত্মীয়তা পাতাইয়া বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিকট হইতে নানা উপায়ে ছড়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার চমৎকার বিবরণ শুনিতে শুনিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, বর্তমানের সেলের চশমা, ঢিলে পায়জামা আর শিল্কের গেঞ্জির তলা হইতে আর একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিল, তাহার পরিধেয় পথের ধূলায় মলিন, তাহার দেহ পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তবুও তাহার মন অদম্য উৎসাহে এক পল্লী হইতে অপর পল্লীতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। স্থধীর দাসের উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়িল।

ছড়া ছাড়িয়া পড়াশুনার কথা অনেক হইল। তাহার আলমারি ভরা মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহের দিকে আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলাম। লোকটি এত পড়িয়াছে ভাবিতেও ভালো লাগে। স্থতরাং পণ্ডিত সে হইবে না তো কি আমি হইব, না হইবে প্রকাশ সেন, সংসারের যন্ত্রণায় যে ধুঁকিতেছে, সওদাগরী অফিসে কলম পিষিয়া যাহাকে দিন গুজরাণ করিতে হয়।

ফিরিবার পথে আমার মনে সন্দেহ রহিল না যে সুধীর দাস প্রকৃতই পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ লোক। প্রকাশ হয়ত ছড়া-প্রবন্ধে সত্যকথাই লিখিতে পারিয়াছিল, তাই সুধীরবাবুর মতামতের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য কি, এমন কতই হয়।

এস্প্লানেডে নামিয়া টুকিটাকি কিনিতে কিনিতে পথশ্রান্ত হইয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাঁচটা বাজে, অফিস ফেরত বাবুরা কাতারে কাতারে চলিয়াছেন। ট্রামে, বাসে তিলধারণের স্থান নাই—বসিয়া বসিয়া কলিকাতার এই বিচিত্র জীবনের ছবি দেখিতেছিলাম। সুধীর দাসের সঙ্গে পরিচয়ে আজ আমার চিত্ত তুষ্ট তৃপ্ত ও উদার হইয়া উঠিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া তাই এই নিত্যকার ছবিই অপূর্ব অনুভূতির সঙ্গে দেখিতেছিলাম। সহসা পার্কের ভিতরের একটি পথে নজর পড়িতেই দেখিলাম প্রকাশ চলিতেছে। সেও নিশ্চয় অফিস হইতে ফিরিল। দিনের আলোকে তাহাকে আরও ক্লান্ত, আরও করুণ মনে হইল। ডাকিতে যাইতে-ছিলাম, আবার কি ভাবিয়া ডাকিলাম না, গোয়েন্দার মত দূরে দূরে থাকিয়া প্রকাশকে অনুসরণ করিলাম।

প্রকাশ এ পথ ও পথ ঘুরিয়া নেবুতলায় একটি সরু গলিতে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আকাশে যেটুকু আলো ছিল, এই সংকীর্ণ গলির মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বাহিরে যেটুকু বাতাস ছিল, এখানে বাড়ি বাড়ি কয়লার আঁচ দিয়া উনুনটি পথে নামাইয়া রাখায় গভীর ধূমে সে বাতাসটুকুও নিরুদ্ধ করিয়াছে। নাকে রুমাল দিয়া আমি হাঁফাইয়া উঠিলাম। একবার ভাবিলাম ফিরিয়া যাই, আবার ভাবিলাম আসিয়াছি তো দেখিয়াই যাই সে কোথায় কি ভাবে থাকে। দমভরে আগাইয়া যাইতেই পায়ের নীচে কয়েকটি ডিমের খোসা গুড়াইয়া গেল। কয়লার ধোঁয়ার, পথের আবর্জনার পচা ভাপসা গন্ধে সঙ্কীর্ণ গলিটি দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। দ্রুত পদে চলিয়া যেখানে যাইয়া থামিলাম দেখিলাম

সেখানেই আমার দিকে তাকাইয়া প্রকাশ পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে। হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেলাম। তবু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, এই যে প্রকাশ দেখ্‌ছি, তুমি এখানেই থাক নাকি ?

হ্যাঁ, বসবে ? বলিয়া প্রকাশ রোয়াকে উঠিয়া চাবি ঘুরাইয়া একখানি ঘর খুলিয়া ফেলিল। ছোট টিনের ঘর, মধ্যে বেড়া দিয়া ছোট ছোট কামরা করা। একটি দরজা, জানালার বালাই নাই। সামনের এক হাত চওড়া রোয়াকে কত যুগ আগে লাল সিমেণ্ট লাগানো ছিল, সন্ধান করিলে এখনও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সবটা চটিয়া ফাটিয়া কদাকার হইয়া আছে।

বারান্দায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, অন্ধকার ঘর গভীর ধোঁয়ায় আরও অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে আসবাবপত্রের নাম-গন্ধ নাই। একটি ছিন্ন চটের থলি বিছাইয়া প্রকাশ আমাকে বসিতে দিল। আমি বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া সে নিজেই বলিল, এখানে বসতে কষ্ট হবে, চলো বরং পার্কেই যাই। আমি সেখানেই প্রায় সময় কাটাই। রাত্রের একটা আশ্রয় চাই, তাই এটা আছে।

সেণ্ট জেমস্‌ স্কোয়ারে পৌছিয়া প্রকাশ এক পয়সার চিনা বাদাম কিনিয়া নিয়া আসিল, বলিল, বাদাম আমার বড় ভালো লাগে। অন্য সময় হইলে হয়ত কথাটা বিশ্বাস করিতে আটকাইত না, কিন্তু তাহার এই ক্ষুদ্র ভালো লাগার বিলাসটুকুও এখন সত্য বলিয়া মনে হইল না। মনে হইল এক পয়সার চিনা বাদাম চিবাইয়া এক আঁজলা জল খাইয়া উদরকে সান্ত্বনা দেয়, 'ঐতো খেলাম, আবার কেন জ্বালা করছ হে উদার উদর।' দারিদ্র্যের এই উলঙ্গ রূপ দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। বোধ হয় দ্বিপ্রহরে সুধীর দাসের বাড়িতে না গেলে এ আঘাতটা এত গুরুতর লাগিত না।

প্রকাশ যেন আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই সেদিন অনেক কথা বলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার মনের জড়তা কাটিয়া গেল। কথায় কথায়

কলেজ জীবনের প্রসঙ্গ, প্রবন্ধ রচনা, পল্লীগীতি সংগ্রহ হইতে আলোচনা সুধীর দাসে আসিয়া থামিল। "পল্লীগীতি পরিচয়" নামক পুস্তক রচয়িতা অধ্যাপক সুধীর দাস যে এবার ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন এবং আমি যে আজ দ্বিপ্রহরে আমার একজন ছাত্রের মধ্যস্থতায় তাহার সহিত পরিচয় করিয়া আসিয়াছি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া প্রকাশের বিশেষ কোন ভাবের পরিবর্তন হইল না। এক সময় শুধু বলিল, "সুধীর ডক্টরেট উপাধি পেয়েছে, এ বড় আনন্দের কথা, বড় আনন্দের কথা।"

প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি সুধীরবাবুকে চেন নাকি?

প্রকাশ প্রশ্নটি এড়াইতে চাহিতেছিল, কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যে আজ সকল কথা খুলিয়া বলিল। প্রকাশ সুধীরের গৃহশিক্ষক ছিল। হুগলীতে সুধীরের বাড়ি, তাহারা বনিয়াদি বংশ। কলেজে পাঠকালে প্রকাশের গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহে আগ্রহ হয় এবং কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া কলেজ পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সে প্রবন্ধ অধ্যাপকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা পাওয়ায় প্রকাশের আগ্রহ বর্ধিত হয় এবং বি-এ পরীক্ষা দিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে অজস্র ছড়া সংগ্রহ করে। এখানে প্রকাশ যে কাহিনী বলিল, এমনকি একদিন কোন ধোপাবাড়ি তাহার রাত কাটাইতে হইয়াছিল, ঢেঁকিশালে শুইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে গৃহ-প্রত্যাগত গর্দভ তাহার স্থানটি অতিথি দখল করিয়াছে দেখিয়া অপূর্ব রাগিণীতে আপত্তি জানাইয়াছিল, একবার একদল স্বদেশভক্ত যুবক তাহাকে গোয়েন্দা সন্দেহে মারপিট করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন সেই গ্রামের এক পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে রক্ষা করেন। অপর পক্ষে আর একবার একজন পুলিশের গোয়েন্দা তাহাকে স্বদেশী দলের গোয়েন্দা ভাবিয়া পুলিশে দিয়াছিল, এই সব কাহিনী প্রকাশ এমন পর পর বলিয়া গেল যে শুনিয়া মনে হইল দ্বিপ্রহরে সুধীর দাস যাহা বলিয়াছেন, এ কথাগুলি তাহারই প্রতিধ্বনি! কোন্‌টি মৌলিক স্থির করিতে আমার বিভ্রান্তি উপস্থিত হইল। দারিদ্র্যপিষ্ট, কর্মক্লান্ত প্রকাশের মুখ হইতে কথাগুলি শুনিতে শুনিতে

আমার মনের মধ্যে একখানি সুন্দর চিত্রে কে যেন মসী লেপন করিয়া দিতে লাগিল। উত্তেজনায় আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। প্রকাশ থামিলে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—তারপর ?

তারপরের কাহিনী শুনিতে শুনিতে ঘৃণায় আমার শরীর কুঞ্চিত হইয়া গেল। প্রকাশের এত শ্রমের সংকলন সমস্তই সুধীর চুরি করিল। শুধু চুরি করিল না, উপরন্তু প্রকাশকেই চোর সাজাইয়া টাকার জোরে জেলে পাঠাইল। কারাবাসের চিহ্ন প্রকাশের দেহ হইতে আজিও যায় নাই। আর প্রকাশের দরিদ্র পরিবার, বৃদ্ধ পিতামাতা, অসহায় ভাইভগিনী কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। সমাজেও প্রকাশের স্থান নাই, সেখানে সে অপরাধী পরিচয়ে সমাজত্যক্ত, সংসারে কেহ তাহার সহায়ক নাই। মানুষ শুধু টাকার জোরে একজন মানুষের যে কি গুরুতর ক্ষতিসাধন করিতে পারে, তাহার মনুষ্য-পরিচয়ও কাড়িয়া লইতে পারে, তাহার জীবন্ত নিদর্শন প্রকাশ।

সব শুনিয়াও তবু জিজ্ঞাসা করিলাম,—:সে তোমার ছাত্র হয়ে এত দূর শত্রুতা সাধন করলে কেন ?

প্রকাশ হাসিল, বড় রিক্ততার হাসি সে। পরে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—সে অনেক কথা ভাই। ভেবেছিলাম কাউকে বলব না জীবনে। কিন্তু তোমার সহৃদয় ব্যবহার আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করেছে। এমন ব্যবহার মানুষের কাছে আর পাব আশা ছিল না।

আমি থিসিস রেডি করেছিলাম, সাবমিট করতে পারিনি। কিন্তু ডক্টরেট পাব এ বিষয়ে নিশ্চিত্ত ছিলাম। প্রাইভেট এম-এ দিয়েছিলাম, শ্রীরামপুর কলেজে একটি কাজও পেয়েছিলাম। তাতে যোগ দেওয়ার অবকাশ দিলে না। আর সুধীরের বোন সুজাতা—থাক্ সে সব কথা আর নাই শুনলে।'

সে না বলিলেও সবই বুঝিলাম। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সহসা প্রকাশ কি বলিতে গেল, অশ্রু তাহার কণ্ঠরোধ করিল। একটু কাসিয়া গলা সাফ করিয়া বলিল—সুজাতা কিন্তু তার মা-বাবার বংশ মর্যাদাও মানে নি, তার দাদার এই বিশ্বাসঘাতকতাতেও যোগ দেয়নি। কঠিন রোগে ভুগে সে চলে গেছে। যাওয়ার আগে জেলেই আমায় পত্র দিয়েছিল তার শেষ প্রণাম জানিয়ে। কিন্তু তখন তাকে কিছু বলবার বা করবার কোনও উপায় ছিল না আমার।

সে দিন দুই বন্ধু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। প্রকাশকে বিদায় দিতে যাইয়া দেখি পার্কে একজনও লোক নাই। পথে একা চলিতে চলিতে আমার পকেটে ভারি কি বস্তু গায়ে লাগিতেছিল। তুলিয়া দেখিলাম একখানি 'পল্লীগীতি পরিচয়'—দ্বিপ্রহরে গ্রন্থকার সুধীর দাস আমাকে উপহার দিয়াছেন, এতক্ষণ সে কথা স্মরণ ছিল না। একটা আলোকস্তম্ভের নীচে যাইয়া নামটা আর একবার দেখিয়া লইয়া বইখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

—শেষ—